ইন্সটিশন
নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত



# কারুর রক্ত চাইতে আসিনি

সুষুপ্ত পাঠক

# কারুর রক্ত চাইতে আসিনি

## সুষুপ্ত পাঠক

একটি ইস্টিশন ইবুক
www.istishon.com

# কারুর রক্ত চাইতে আসিনি

## সুষুপ্ত পাঠক

**© সুষুপ্ত পাঠক**
এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

প্রথম ইবুক প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

**ইস্টিশন ইবুক**

**প্রকাশক**

ইস্টিশন
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

**প্রচ্ছদ: স্বচা**

**ইবুক তৈরি**
নরসুন্দর মানুষ

মুল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে

Karur Rokto Chaite Aasini. by Susupto Pathok

Istishon eBook
First eBook Published in **February, 2017**
**Created by: NoroSundor Manush**

**“পন্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন,**
**কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে ... লিখিত হয় নাই”**

# উ ৎ স র্গ

**বাংলা ব্লগ ও ব্লগারদের উদ্দেশ্যে**

# সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}


ভূমিকা। **০৭**

কারুর রক্ত চাইতে আসিনি। **০৯**

মানুষ কোথায়। **২১**

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সামঞ্জাস্য নাকি সাংঘর্ষিক। **২৯**

বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক পরিচয়: অনেক সূত্রের যোগফল। **৩৬**

শরৎচন্দ্র ও সমকালীন হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক। **৪৪**

বাংলা বাঙালী মুসলমান। **৫৬**

শেষ পৃষ্ঠা। **৭৫**

# ভূমিকা

ব্লগে লেখার শুরুতে কখনো চিন্তাতেই আসেনি নিজের লেখাগুলো বই আকারে বের করতে হবে। অনলাইনে লিখতে আসার অন্যতম কারণ ছিল প্রচলিত ছাপানো মাধ্যমে যে প্রতিষ্ঠানিক গোষ্ঠি, লিটল ম্যাগের মাতুব্বরি, দৈনিকের সাহিত্য পাতার মাস্তানি-তাকে মেনে নিয়ে এক ধরণের গৃহপালিত রচনা লিখতে অপারগতা থেকে। সম্ভবত ব্লগারদের প্রায় সকলেরই একই মানসিকতা থাকার কারণে বাংলা ব্লগ দ্রুত মুক্তচিন্তার প্রথা বিরোধী একটা মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। এক সময় মূলধারা কাগজের মাধ্যমের লেখকদেরও ব্লগারদের লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে হলো। এমনকি দেশের বুদ্ধিজীবীরাও ব্লগারদের নিয়ে নানা মন্তব্য করা শুরু করলেন। 'গৃহপালিত রচনাকারীদের' চক্ষুশূল হয়ে উঠল ব্লগাররা। এটা ব্লগে লেখালেখি করা সমস্ত লেখকদের জন্যই একটা বিজয়। তাদের সম্মিলিত লেখালেখির এক একটি ঢেউ আছড়ে ফেলেছে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

অনলাইনে বিগত দশ বছরের লিখিত শত শত গুরুত্বপূর্ণ রচনার আজ বেহাল হবার দশা। বিশেষত ব্লগগুলোর মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতা, নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কারণে অনেক ব্লগ সাইট বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে ব্লগাররা ইন্টারনেটে নিজেদের ব্লগে লেখাগুলো রাখার চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই কিছু উদ্দোমী সুহৃদয় এগিয়ে এসেছেন ব্লগারদের লেখাগুলোকে একত্রে করে ই-বুক তৈরি করে ইন্টারনেটে রেখে দেয়া যাতে লেখাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থেকে এক মলাটে পাওয়া যায়। যাতে একজন উৎসুক পাঠক একজন লেখকের অনেকগুলো রচনা এক ক্লিকেই পেয়ে যান। সেই চিন্তা থেকে **ইস্টিশন** ব্লগের প্রাণ ভোমরা **নূর নবী দুলাল** এবং ব্লগার **নরসুন্দর**

**মানুষ...** উদ্যোগ নিয়েছেন ই-বুক তৈরির। বাংলা ব্লগে বহু বড় বড় লেখক আছেন, তাদের সঙ্গে আমার মত একজনের লেখা নিয়ে বই করতে চাওয়াতে খুশি যেমন হয়েছি একই সঙ্গে বিব্রতও হয়েছি। যাই হোক, এক এক করে আশা করি সকল ব্লগারদের গুরুত্বপূর্ণ লেখাই ই-বুক আকারে প্রকাশিত হবে। অনেকেই জানতে চান ছাপানো বই কবে বের হবে। তাদের আশান্বিত করে আপাতত কিছু বলা যাচ্ছে না। কেননা বাংলাদেশে ব্লগারদের বই প্রকাশ না করতে অঘোষিতভাবে প্রকাশকদের মধ্যে একটা ঐক্য হয়েছে। মূল কারণ প্রকাশকরা কোন মুক্তমনা ব্লগারের বই বের করে মৌলবাদীদের টার্গেট হতে চায় না। তাই কিছুদিন এই ই-বুকই আমাদের ভরসা...।

এই বইতে মোট ছয়টি লেখাকে স্থান দেয়া হয়েছে। লেখাগুলো **মুক্তমনা** ব্লগ, **ইস্টিশন**, **শুদ্ধস্বর** অনলাইন ম্যাগাজিন ও আমার ফেইসবুক আইডিতে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত কিছু স্মৃতিচারণসহ ইতিহাস নির্ভর লেখাগুলোকে এখানে ঠাই দেয়া হয়েছে। পাঠকদের লেখাগুলো পড়ে যদি মনে হয় লেখাগুলো ই-বুক করে সংরক্ষণ করা যৌক্তিক হয়েছে তাহলে বইটি পূণঃলেখাসহ অন্যান্য কারিগরি দিক নিয়ে যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রত্যেকের শ্রম স্বার্থক হবে। সেই প্রত্যাশাতেই-

**সুষুপ্ত পাঠক**
ব্লগার, এক্টিভিস্ট
ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

# কারুর রক্ত চাইতে আসিনি

মুহাম্মদ জাফর ইকবালের একটা কলাম (খুব সম্ভবত সমকালে) পড়েছিলাম যেখানে তিনি লিখেছিলেন, সেই ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তার মা যখন একটা বিপদগ্রস্ত হিন্দু পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করছিলেন তখন তাদের প্রতিবেশী মহিলা বলেছিলেন, সাহায্য করতে হয় কোন মুসলমানকে করুন, হিন্দুদের করলে কোন সোয়াব পাবেন না...। এখন আমরা খুব সহজেই ইসলামী সোর্সগুলো থেকে জানতে পারি অমুসলমানের জন্য দোয়াও করা যাবে না এরকম মত আছে ইসলামে। কিন্তু ছোটবেলায় এতসব তো জানার উপায় ছিল না। ছোটবেলায় দেখতাম বিটিভিতে দিনের শুরুতেই হতো কোরআন পাঠ দিয়ে। তারপর বাংলা তরজমা ও মোনাজাত। তারপর উদার ইসলামী রাষ্ট্রের" প্রতীক হিসেবে গীতাপাঠ নয়ত ত্রিপিটক পাঠ দেখানো হতো। সেই ছোটবেলায় একটা জিনিস খেয়াল করেছিলাম, কোরআন পাঠের পর যে বাংলা তরজমা হতো তার শেষে জোব্বা পরা মৌলবী শুধু মুসলমানদের জন্য হাত তুলে দোয়া করছেন, পক্ষান্তরে গীতা বা ত্রিপিটক পাঠের শেষে বলা হচ্ছে, জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক'। জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে মুসলমান-খ্রিস্টান-ইহুদীও পড়ছে। হুজুর কিন্তু খুব সেয়ানা, পাছে হিন্দু মূর্তি পূজারী, ইহুদী, খ্রিস্টানের কল্যাণ হয়ে যায় তাই শুধু মুসলমানের জানমালের জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছেন!

যাই হোক, হিন্দুরা যে খুব অসাম্প্রদায়িক এ কথা এখানে বলা হচ্ছে সেরকম মনে করার কোন কারণ নেই। ধার্মীকরা পরস্পরকে কি পরিমাণ ঘৃণা আর বিদ্বেষের চোখে দেখে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার আছে। অনেক বছর আগে এক হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে তাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। সন্ধ্যেবেলা সে বাড়িতে কীর্তন হয়। হরে কৃষ্ণ

হরে কৃষ্ণ... হরে রাম হরে রাম...। অনুষ্ঠান শেষে প্রসাদ আসে, বাতাসা, ফলমূল, সন্দেশ... খেতে দারুণ লাগে। একটা হিন্দু পরিবারে থাকছি খাচ্ছি আমার কোন সমস্যা নেই। তারাও আমি মুসলমান বলে কোন সমস্যা দেখছি না। কিন্তু এক সন্ধ্যাবেলা প্রচন্ড এক ধাক্কা খেলাম। সেদিন সারা রাত পূজা দেখতে বের হবো গ্রাম ঘুরে ঘুরে, যে বাড়িতে উঠেছি সেই বৌদি জোর করে ভাত খেয়ে যেতে বলছিলেন। আমার একদম ইচ্ছা ছিল না। তার জোরাজুরিতে বললাম আচ্ছা দেন এখানেই চট করে খেয়ে নেই...বলেই ভাতের থালাটা বিছানায় রেখে খেতে যাবো, ওমা, বৌদিসহ উপস্থিত আরো দুই-একজন মহিলার চোখগুলো সব বিস্ময়ে গোল হয়ে গেলো! একজন তো জিভে কামড় দিয়ে চেয়ে রইল। আমি আমার জীবনে এতটা অবাক কোনদিন হইনি। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না কি। চেয়ে রইছি বিব্রতভাবে। কিছু একটা ভয়াবহ অন্যায় করে ফেলেছি বুঝছি কিন্তু কি সেটা বুঝতে পারছি না। শেষে বৌদি বললেন, তুমি শেখের পো?

তখনো বুঝলাম না কি বলছে এই মহিলা। আমার মুখ দেখে এবার বললেন, তুমি মুসলিম?

বললাম, হ্যাঁ!

বৌদির মুখ পাংশু হয়ে গেলো। বললেন, ও!

পুরো ঘর জুড়ে তখন নিরবতা। আমার বন্ধুটি কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে আমার দিকে তাকাতে পারছে না। আমার মেজাজ সে জানে। ইডিয়েটটা আমার পরিচয় গোপন করেছে। সম্ভবত আমার তথাকথিত "মুসলিম" পরিচয় দিলে আমি এখানে গৃহিত হতাম না। পরে জেনেছি বিছানায় বসে ভাত খেতে চেয়েছি জেনে তাদের মনে প্রথম সন্দেহ ঢুকে আমি বিধর্মী। গ্রামদেশে খুব গোঁড়া হিন্দু পরিবারে ভাত-মাছ নিয়ে বিছানায় বসে খাওয়া নাকি এখনো কল্পনা করা যায় না। যাই হোক,

আমি নিশ্চিত এই অভিজ্ঞতা আমার জায়গায় অন্য কারুর হলে সে প্রচন্ডভাবে হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে উঠতো। কিন্তু আমি তখনই পুরোপুরি নাস্তিক, কোন রকম ধর্মীয় ভাবাবেগ নেই। আমি এটাকে দেখেছি আমাদের হিন্দু-মুসলিম সামগ্রিক চিত্র হিসেবে। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। আমরা আসলে কোনদিনই অসাম্প্রদায়িক ছিলাম না। আমরা একটা প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক জাতি। গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষই ঘোর সাম্প্রদায়িক। এদের কাছে পোষা ককুর-বিড়ালের মর্যাদা আছে কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন মর্যাদা নেই। আমি এখনো শুনি বহু শিক্ষিত সজ্জন মানুষ এভাবে বলে, লোকটা হিন্দু হলেও খুব ভাল!

আমি যে অফিসে কাজ করি সেখানে গত রমজান মাসে ক্যান্টিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। হিন্দু স্টাফরা খাবার এনে ক্যান্টিনে বসে খাবে সেটাও কর্তৃপক্ষর সহ্য হয়নি। নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে, পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ক্যান্টিন বন্ধ রাখা হলো। হিন্দু কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ অফিসের বাইরে গিয়ে যেন লাঞ্চ সারে ইত্যাদি, এইরকমই ছিল তাদের বক্তব্য। এখনো পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্র নিয়ে হাজার অভিযোগ থাকার পরও এসব আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়নি। রাষ্ট্র পুরোপুরি ধর্মান্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু তাতে আমাদের ধর্মান্ধ হতে বাঁধা নেই। এরকম হাজার হাজার বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, মালিকের ইচ্ছা, উৎসাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশে এসব ঘটে চলেছে রোজ। আমার মুসলিম কলিগদের দেখলাম এহেন ইসলামী সিদ্ধান্তে তাদের সহমত জানাতে। স্বাভাবিকভাবে আমার হিন্দু কলিগ বেজায় মন খারাপ করলেন। আমি জানি এখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে আর এই অফিসে এরকম কোন হিন্দুবান্ধব সিদ্ধান্ত হলে এই কলিগই সেটাকে স্বানন্দে গ্রহণ করতো সহমত জানিয়ে। কারণ আমার এই হিন্দু কলিগ আর আমার মুসলিম কলিগরা একই ছাঁচে গড়া। কেবল বিশ্বাসের পার্থক্যর কারণে একজন ফেঁসে গেছেন। নইলে এরা একই রকম সাম্প্রদায়িক চরিত্রের মানুষ। আর কেনই বা হবে না বলুন। এই সমাজের তো

সবাই। একই শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র তাদের। এই পরিবেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছাড়া আর কি-ই বা গ্রহণ করার আছে তাদের?

এসব কথা চিন্তা করেই নিজের মধ্যে একটা প্রচন্ড তাগিদ অনুভব করলাম যে, এ খাঁচা ভাঙ্গতে হবে। কিন্তু "এ খাঁচা ভাঙ্গবো আমি কেমন করে? "মনে করলাম আমি নিজে কিভাবে ভেঙ্গে ছিলাম? তবুও কাজটা কঠিন মনে হলো। সব মানুষ এক রকম না। সবার চিন্তার ক্লাশ এক রকম থাকে না...।

চিন্তা করলাম লোকজনকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যে দেশের রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়িয়ে আছে সে দেশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার কথা বলাটা বোধহয় দম্ভই হলো! কিন্তু যারা শিক্ষিত বলতে সার্টিফিকেট ও স্কুল-কলেজের প্রথা মাফিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুঝেন না বা মানেন না তারা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আমার ধারনাই সঠিক। সেই লক্ষ্যে আমি আমার পরিচিত গন্ডিতে একটা পরিবর্তন আনার চেষ্টা করলাম।

বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, সেই রুশ বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবীরা যেমন গোপনে বইপত্র চালাচালি করতো, ইংরেজ আমলে স্বদেশীরা যেমন শরৎচন্দ্রর "পথের দাবী" আদান প্রদান করতো সেরকম করে আমি বইয়ের মলাট ফেলে দিয়ে আগ্রহীদের দিতে লাগলাম। ফলাফল হাতে হাতে পেলাম: "তোমার এই বিশ্বাস নিজের মধ্যেই রেখো, অন্যকে এর মধ্যে টেনো না!"-অগ্রজদের সদুপোদেশ আমার প্রতি। তাদের মতে আমার আদর্শ-বিশ্বাস খুবই ক্ষতিকারক সমাজের জন্য। আমি আমার সমবয়সী অনেককেই বিদ্রোহী করে তুলেছি। অনেক পরিবারের অশান্তির কারণ আমি! আমি তাই অনেকেরই চক্ষুশূল...।

বছর পাঁচেক আগের কথা এসব। আমাকে নিয়ে এসবই ছিল পরিচিত মহলের মূল্যায়ন। আমার অপরাধ কি ছিল? আমি আমার পরিচিত মহলে বইয়ের ভাইরাস

ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। জানার অদম্য কৌতূহল সৃষ্টি করে ছিলাম। অন্ধ বিশ্বাসের বদলে যুক্তিকে একমাত্র পাথেয় করতে শিখিয়েছিলাম। কুসংস্কারের বদলে বিজ্ঞানমনস্ক হতে শিখিয়ে ছিলাম। পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য করে দিয়েছি ধরে ধরে। খুবই সাধারণ এইসব মানুষ হঠাৎ বদলে যাওয়ায় প্রথাপ্রিয়, সংস্কার প্রিয়দের চোখে পড়ে যায়। বিনা বাক্য ব্যয়ে এতদিন এই সুবোধ ছেলেরা যা করে এসেছে এখন তারাই প্রশ্ন করছে, কি, কেন, কিভাবে? সমাজ তো ক্ষেপে যাবেই!

সত্যি সত্যি ক্ষেপে উঠেছিল আমার উপর অনেক মানুষ। ব্যাপারটা যে সিরিয়াস সে সম্পর্কে আমার ধারনা ছিল না। তাদের ছেলে নামাজ পড়ে না, তাদের ছেলের দেবদেবীতে এখন ভক্তি নেই, নানা রকম উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে। সবচেয়ে বড় কথা তারা অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে! এখানে বলে রাখি এমনিতে আমরা ভদ্রজন অসাম্প্রদায়িকতার কথা খুব বলি কিন্তু বাস্তবে যখন একজন মানুষ অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠে (যে নিজেকে কোন সম্প্রদায়ের মনে করে না) সেটা হজম করার মানসিকতা আছে কতজনের?

যাই হোক এলাকার সমাজপতিদের কাছে আমার নামে বিচার যেতে লাগলো। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে জানতে চাইলেন, তুমি আল্লাহ-খোদা মানো না? কি আশ্চর্য, এই ছেলে ধর্ম মানে না! ...

আমার অনেক বন্ধুর বাড়ির দরজাই আমার জন্য চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো। প্রচলিত ধর্ম ও প্রথাকে যে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে, এতদিন ধরে চলে আসা সিস্টেমকে যে বাঁধাগ্রস্ত করে তাকে তো এসব পোহাতেই হবে। লোকজনের অবস্থা দেখে অবাক হলাম। যেন ছেলে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে সেরকমই তাদের উদ্বেগ। এক বন্ধুর বাবা শপথ করালেন ছেলেকে নামাজ পড়ার। শুনতে যতই অবাস্তব লাগুক, আরেক বন্ধুকে নতুন করে কলেমা পড়ানো হলো। আমার আরেক হিন্দু বন্ধু "ইয়াং বেঙ্গলদের" অনুকরণে প্রকাশ্যে গরুর বিরিয়ানী খেয়েছে বিদ্রোহের অংশ হিসেবে। তাকে বাড়িতে

কান্নাকাটি করে গোবর খাওয়ানো হলো। আমি জানতাম এর মধ্যে কিছু "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে"। হয়েছিলও তাই। তারা শেষ পর্যন্ত ঘরেই শুধু ফিরে যায়নি উগ্র ধর্মবাদী হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাকে গিলে ফেললে হজম হয় না, তাকে আত্মস্থ করতে হয়। শুনেছি ইয়াং বেঙ্গলদের অনেকেই শেষ বয়েসে ধর্মের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিলেন। মাইকেল মধুসদন দত্ত ইয়াং বেঙ্গলদের কার্যকলাপ নিয়ে ব্যঙ্গ করে প্রহসন লিখেছিলেন "একেই কি বলে সভ্যতা" নামে। আমার এক বন্ধু সদ্য নাস্তিক হয়ে ঈদে নতুন জামাই নিবে না! ঈদের দিনে বাড়িতে সেমাই খাবে না! মা কাঁদে ছেলের কীর্তিতে। তাকে বললাম, হারামজাদা, আমি আমার মার জন্য ইফতারি কিনে নিয়ে যাই। ঈদে একটা পাঞ্জাবী পেয়েছি মার কাছ থেকে সেটাও পরবো। ধর্মকর্ম করি না বাড়িতে সবাই জানে, তাই ঘাটায় না। খ্রিসমাস দেখেছিস, সারা দুনিয়ার মানুষ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে উৎসব হিসেবে নিয়ে একটা দিন আনন্দ হৈ-হল্লা করে কাটায়। ঈদকে সেরকম করতে পারিস কিনা সেটা চেষ্টা কর। এগুলো রাতারাতি উঠে যাবে না। বরং এই উৎসবগুলোকে একটা সেক্যুলার চরিত্র দেয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা করতে হবে। সে আমার সঙ্গে একমত হতে পারলো না। বরং আমাকেই সে ভন্ড বলে অভিহিত করে ফেলল। অথচ আমার সঙ্গে চলেই তার নাস্তিকতার হাতেখড়ি। এই ২০১৩ সালে তার সঙ্গে আমার দেখা। সে এখন সাচ্চা মুসলমান। এই নাস্তিক সরকার যে সাঈদীর মত আলেমকে ফাঁসি দিচ্ছে এটা সে কোন মতেই মেনে নিতে পারছে না। বললাম, নামাজ পড়িস? সে অতান্ত দৃঢ়তা সঙ্গে বলল, নিশ্চয়! যতবার আল্লাহো আকরব বলি ততবার বুকের ভেতরে আল্লাকে অনুভব করি...।

ধর্ম মানুষের মনে ঘৃণা আর আক্রোশ কতটা এনে দিতে পারে টের পেলাম যখন আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বসন্ত নামের রোগটা দুনিয়া থেকে চিরতরে চলে গেছে শুনেছিলাম। যদিও শীতলা দেবীর পূজা আজো ধুমধাম করে হয়। তো দেবীর যে পুরোপুরি প্রসার এখনো যায়নি বোধহয় সেটা জানান দিতেই আমাকে গিয়ে পাকড়াও করলো। একদিন দুপুরের পর মাথা আর শরীরের ব্যথা অনুভব করতে

লাগলাম। একটু জ্বর জ্বর লাগছিল। কর্মক্ষেত্র থেকে বিকেলের আগেই বাড়ি চলে এলাম। শরীর খুব খারাপ লাগছে, শুয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি পিঠে একটা গোটার মত, চুলকাচ্ছে, আঙ্গুল লেগে গলে গেলো। বুকের কাছেও একটা দেখতে লাগলাম। লোকে ধারনাও করতে পারলো না পক্স যে একালে এতটা ভয়াবহ হতে পারে। সেই ষাট-সত্তর বছর আগের ভয়ংকর রূপে যেন ফিরে এসেছে সে! খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। কারণ গলার ভেতরও গোটা উঠেছে, সারা শরীরে গোটা। বেশির ভাগ সময় চেতনা থাকে না। অনেকেই ভাবলো আমি মারা যাচ্ছি। হাত তুলে অনেকেই বলল, শুকুর আলাহামদুরিল্লাহ! আল্লাহ গজব নামছে! আল্লা খোদারে নিয়া আকথা-কুকথা কইলে এইরকমই হইব...।

আল্লাহ বলেন, আবু লাহাব তুমি ধ্বংস হও! আল্লাহ কেন আমাদের মত তুচ্ছ মানুষের সঙ্গে দ্বৈরথে নামেন? চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন অতিতের ভয়ংকর সব রোগ মামুলি হয়ে পড়েছে। ডায়রিয়া, কলেরায় এক সময় বাংলার গ্রামকে গ্রাম ছাফ হয়ে গেছে। মানুষ মানুষকে অভিশাপ দিতো, তুই ওলাউঠা হয়ে মরবি! এখন কলেরায় টিকা আবিষ্কার হয়েছে। ডায়রিয়ায় পাঁচ টাকা দিয়ে স্যালাইন কিনে চিকিৎসা করা যায়। আল্লাহ হাতে যতগুলো মরান্ত্র ছিল তার বেশির ভাগ মানুষ ভোঁতা করে ফেলছে। কারণ তিনি বলেন, এসব দিয়ে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। শাস্তি দেন। যাক এসব কথা। শেষ পর্যন্ত আমি মরলাম না। বেঁচে উঠলাম।

মানুষ জন্ম থেকে সাম্প্রদায়িক হয় না, তাকে বানানো হয়। মুসলমান বাড়ির তরকারী হিন্দু বাড়িতে গেলে সেটা নির্ঘাত ড্রেনে যাবে। মুসলমানের বাড়িও একই কথা খাটে। খাবারের মধ্যে কি লেগে থাকে? আমার এক বন্ধু হিন্দুদের দেয়া কোন খাবার খায় না। তার নাকি বমি আসে। কিরকম একটা গন্ধ পায় সে। হিন্দুদের দোকানের দই-মিষ্টি অবশ্য রাক্ষসের মত খায়। মানুষের ধর্মটা আসলে কি? আমার এই বন্ধুই যখন পতিতালয়ে গেলো তখন তার মুখ থেকেই শোনা গল্পটা বলি। যে মেয়েটাকে ফূর্তি

করার জন্য নিয়েছে সে যখন জানলো তার খরিদদার আর তার বাবার নাম একই তখন সে কাজ করতে অস্বীকার করলো। বাবার নামের কাউকে সে কাজ করতে দিবে না। আমার বন্ধুটি জোর করে তার কাছ থেকে শরীর আদায় করে নিলো। হতভাগ্য মেয়েটির শিশুটি তখন চৌকির এক কোণায় খিদের জ্বালায় চিৎকার করে কাঁদছিল। মেয়েটা বিধ্বস্ততা শেষে উঠে বাচ্ছাটাকে দুধ খাওয়ায়।...মানুষের ধর্ম আমার কাছে এইরকমই। সমাজ বিতাড়িত, পাপীষ্ঠ, পতিত এই মেয়েটির ধর্ম আসলে আমার ধর্ম। বিবেক, বিবেকই ধর্ম...। যে বন্ধুটির কথা বললাম, সে রমজানের এক মাস কোন রকম "পাপ কাজ" করে না। যেমন, হিন্দী সিনেমা দেখা, রাতের বেলা মেয়েদের সঙ্গে ফোনে আলাপ, অনলাইনে এডাল্ট সাইটে যাওয়া, এই সময় সে সেভ না করে একমাস দাড়ি রাখে, সবক'টা রোজা রাখে তারাবিসহ... টিপিক্যাল বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা যেমন হয় আর কি। আমাকে সে মনে মনে অপছন্দ করে জানি। সে আড়ালে আমাকে "হিন্দুদের দালাল" বলে উল্লেখ করে। তার কারণ আছে অবশ্য, একটা উদারহরণ দেই।

পাড়ায় দূর্গা পূজা হচ্ছে। মুসলমান পাড়ায় হিন্দুর পূজা তাও আবার রমজান মাসে! এই মাসে ইবলিশের মাথায়ও টুপি উঠে। মুসলমান হয়ে উঠে খুবই স্পর্শকাতর। কোন রকম কাফিরী কাজ কারবার সে সহ্য করতে পারে না। এলাকার হিন্দু বড়ভাই যারা পূজাটা করছেন তাদের দেখলাম জুনিয়র থেকে জুনিয়র ছোট ভাইদেরকে পূজাটা ভালভাবে শেষ করার জন্য বিনীত সহযোগীতা চাচ্ছেন। আমার দেখে খারাপই লাগে। সেই বড়ভাই (বিকাশদা) ভারতে চলে গেছেন কতদিন হয়। সেখানে কি তাকে এভাবে করজোরে পূজা সমাপ্ত করতে কারুর সহযোগিতা চাইতে হয়? দাদা কি সেখানে কঠিন মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে গেছেন? খুব সম্ভব হয়েছেন। আগেই বলেছি বেশির ভাগ মানুষ সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতাকে এভাবেই নেন। যাই হোক, পাড়ার মসজিদ কমিটি থেকে পূজা কমিটিকে বলা হলো, মাগরিবের নামাজের সময় ঢোলঢোক্কর বন্ধ রাখতে হবে (এটাই হিন্দুদের দেবীর আরতির সময়, আচ্ছা ভাবুন

মুসলিম সম্প্রদায়কে বলা হচ্ছে মাগরিবের নামাজটা আরতির সময় বন্ধ রাখা হোক!), দশমী করতে হবে বাজনা ছাড়া, যতটা কম আড়ম্বনা ছাড়া, সেটা অবশ্যই সন্ধ্যার আগে কারণ তখন সেটা ইফতারির সময়, নামাজের সময়, নয়তো রাত দশটার পর যেন করে। পূজা কমিটি এক কথায় রাজি।

নবমীর দিন পূজা মন্ডবে গিয়েছি, হিন্দু বন্ধুরা, মুসলিম বন্ধুরা আড্ডা মারছি। দশভূজা দেবী ও তার কন্যা-সন্তানসহ জাঁকজমক ভাবে হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছেন, আসলে চেয়ে আছেন কিন্তু কিছু দেখছেন না যেন। সরস্বতী দেবীকে আমার খুব পছন্দ। তার রূপ আর স্টাইলের জন্য। এক মুসলিম বন্ধু ফিসফিস করে দেবী ও দেবী কন্যাদের নারীত্বের চিহ্নগুলোকে নিয়ে আদিরসাত্মক মন্তব্য করতে লাগলো। আমার সেই বন্ধুটি আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল, দোস্ত দেখ, এই চুতমারানী মাগীগুলির নিচ দিয়া (আসলে লেখার অযোগ্য একটা শব্দ ছিল সেটা) বাঁশ গাঁইথা খাড়া কইরা রাখছে, এই গুলির নাকি কত ক্ষমতা! অহন গিয়া লাথি মাইরা আয়, দেখ অরা নিজেরা নিজেগো বাঁচাইতে পারে কিনা...। মুসলিমরা সবাই একমত হলো। আমি বললাম, কাবাঘরও তো কতবার ভাঙ্গলো। বন্যায় একবার, একবার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। হজরে আশওয়াদ যেইটারে হজে গিয়া চুমা খাও, চুরি গেলো কাবা ঘর থিকা, কই আল্লায় তো রক্ষা করতে পারলো না তার ঘর আর তার ইজ্জত! ...

বলুন, এরপরও ওরা আমাকে দালাল বলবে না কি বলবে?

তাহলে হিন্দুরা কি আমাকে বন্ধু মনে করে? আমার ইসলাম বিরোধী কথাগুলোর যেগুলো তাদের পক্ষে যায় তখন আমি তাদের কাছের মানুষ। কিন্তু যখন আমি বলি রামচন্দ্র হচ্ছে একটা গল্পের চরিত্র, তার ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। অযোধ্যার মাটি খুঁড়ে ফ্যালা ফ্যালা করে ফেললেও তার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যাবে না...। উচিৎ কথায় মানুষ বেজার, গরম ভাতে বিড়াল বেজার। আমি হিন্দু-মুসলিম

দুটোর শত্রু। এটা আরো বেড়ে গেলো যখন কথিত মা কালির আর্বিভাবে আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলাম।

১৫-১৬ বছরের এক যুবতী মেয়ের উপর হঠাৎ মা কালি ভর করেছেন দয়া করে। ক্ষণে ক্ষণে মায়ের আবির্ভাবে যুবতীর ভাবসমাধি হয়। মুখ দিয়ে গেঁজলা বের হয়। তখন মেয়েটি যা বলে সব ফলে যায়। আশির্বাদ দিলে লেগে যায়! সন্ধ্যার পর মূর্খ হিন্দু নারী-পুরুষরা ভিড় করতে লাগলো এই হিস্টরিয়া রোগী মেয়েটির কাছে অথবা অভিনয় করে প্রতারণা করা মেয়েটার কাছে। তবে প্রতারণা করার সম্ভবনাই যথেষ্ট কারণ সে আমার চ্যালেঞ্জে রাজি হয়নি। আমার কলেজ জীবনে পড়া প্রবীর ঘোষের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমি মেয়েটিকে বলেছিলাম, আমার পকেটে একটা একশো টাকার নোট আছে, মা জননী যদি কষ্ট করে নোটের নাম্বারটা হুবহু বলে দিতে পারেন, কথা দিচ্ছি নাস্তিকতা তো ছেড়েই দিবো, ইসলাম ছেড়ে হিন্দু হয়ে যাবো! সে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি কিন্তু তার বদলে ব্রাহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছে। অভিশম্পাত করলো, এই বেয়াদপীর ফল ভাল হবে না দেখিস!

হিন্দুরা সত্যিই আমার এই বেয়াদপীকে ভালভাবে নেয়নি। চোখ-মুখ কুঁচকে সেটা তারা প্রকাশ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছে। আড়ালে সবাই বলেছে, এই মুসলমানটা কেন আমাদের এইখানে আসে! আমাদের ধর্মকর্ম নিয়ে সে কেন মাথা ঘামায়...।

এই ঘটনায় আরো একটা অভিজ্ঞতা যেটা আমার হলো সেটা চমৎকৃত। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অলৌকিত্বে যে আমাদের বংশ পরম্পরায় কুসংস্কার আছে তা ধর্ম চেতনাকেও হার মানায়। যে মেয়েটির উপর কথিত কালির আবির্ভাব হয়েছে সে থাকতো এক মুসলমান বাড়িঅলার বাড়িতে ভাড়া। প্রায় মন্দির হয়ে পড়ায় বাড়িঅলা যখন এদের বাসা ছেড়ে উঠে যেতে বললেন তখন আড়ালে বলা হলো, মাকে এভাবে অপমান করে তাড়ালে ঝাঁড়ে নির্বংশ হয়ে মরতে হবে। মায়ের রোষ তো জানে না...। চট্টগ্রামের কী এক পীরের মুরিদ এই বাড়িঅলা এই কথা লোকমুখে শুনে দমে

গেলো। যত যাই হোক, কার মধ্যে কি আছে কে জানে, যদি সত্যি সত্যি নির্বংশ হয়ে মরতে হয়! বাড়িঅলা চরম অস্বস্তিতে পড়ে চুপ করে গেলেন। দেখলাম চুপি চুপি অনেক মুসলমান বাড়ি থেকে নানা রকম মানত করে লোক মারফত টাকা-পয়সা পাঠানো হচ্ছে এই মা কালির মন্দিরে! এক বছরের মধ্যে ভাল দেখে একটা জায়গা বেছে পাকা মন্দির করে এই স্বঘোষিত মা "কালি" এখান থেকে উঠে চলে যান। শুনেছি তার প্রসার এখনো ভাল। রোজ দুই-আড়াইশো ভক্ত এসে জুটে। মানুষের নানারকম দুঃখ-কষ্ট আর অভাবঅনটনের জীবন। মায়ের কাছে এসে সমাধান চান। বলে, মা রক্ষা করো, আর যে পারছি না!...

এই অসহায় মানুষগুলিকে আমি গালি দিতে পারি না। রাগ করে থাকতে পারি না বেশিক্ষণ। এই দরিদ্র, বিপুল জনসংখ্যার একটা দেশে, যেখানে সম্পদের তুলনায় চাহিদা ব্যাপক, আছে অশিক্ষা আর কুশিক্ষা, তারা তো প্রতিদিনের জীবনের কাছে হেরে গিয়ে এইরকম আল্লা আর মা জননীর কাছেই দিন শেষে ধরনা দিবেই। দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে কি বলা যাবে, যাও, তোমার আল্লার কাছে যাও, তিনি সব পারেন! কিংবা আল্লা ভগবানই তো খাওয়ায় পরায় তার কাছেই যাও...। অসহায় মানুষ খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়। তাই এই মানুষগুলোই যখন "নাস্তিক ব্লগারের" ফাসি চায়-আমি তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে যাই না। যারা রোজ আমাকে ফেইসবুকের ইনবক্সে গালাগালি করে তারাও এই সমাজ ব্যবস্থার শিকার। আমি খুব পরিস্কারভাবে বলি ও লিখি ইসলামী জংঙ্গিবাদের আতুরঘর খোদ ইসলাম! তাতে আমি ইসলাম বিদ্বেষী কিন্তু আমি মুসলিম বিদ্বেষী নই তাই ফারাবী ও নাফিসের জন্য আমার মনে কোন অন্ধ ক্রোধ নেই কারণ আমি জানি তারা এই ইসলাম দ্বারা শিকার হয়েছেন মাত্র। এইমাত্র যে কিশোরটি শিবিরে যোগ দিতে মনোস্থির করলো আমার লেখালেখি তার জন্য। আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতা সীমিত আমি জানি। কিন্তু ব্লগে যারা স্বনামধন্য লেখক আমার বিশ্বাস তারা এজন্যই আয়ু পুড়িয়ে লিখে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক ইসলাম মাথাচাড়া দিয়ে না উঠলে হয়ত এসব নিয়ে আমাদের লিখতে হতো না। এমন একটা

সময় এখন আমাদের সামনে যখন "সুধাংশু তুই পালা"র মত লেখা লিখতে হয়। বডার্র পার হয়ে যে হিন্দু পরিবারটি চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদেরকে আটকান। অভয় দিন। প্রতিটি মুক্তমনা, নাস্তিক নিজেকে প্রশ্ন করুক কেন সে ব্লগে-ফেইসবুকে লিখতে এসেছে? নাস্তিকতা কি ধর্ম যে সেটা প্রচার করতে হবে? সারা দুনিয়ার মানুষ নাস্তিক হয়ে যাবে এরকম যারা বিশ্বাস করে তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে বিরাট ভুল আছে। আমরা শুধু তাদের ভাবনার খোরাক জুগিয়ে দিবো। তাদের একটা বিরাট অংশ প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসবে না ঠিকই, তবে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিগুলো ভোতা হয়ে যাবে। "সুধাংশুকে" তখন আর পালাতে হবে না। আয়েশাদের পাশে আরতীরাও তখন নিশ্চিন্তে বাস করতে পারবে। সেই সুদিনের প্রত্যাশায় আমরা নাস্তিক-মুক্তমনারা লিখি কারণ লেখার চাইতে অন্য কোন যুদ্ধ শুধু রক্তই ঝরাবে। কারুর রক্ত তো চাইতে আসিনি...।

# মানুষ কোথায়?

অনেকদিন আগে এক গ্রাম্য হিন্দু মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম, আমি তখন যে এলাকায় থাকি তার নাম ছিল "পানির ট্যাঙ্কি", মেয়েটি আমাকে জানালো সে "জলের ট্যাঙ্কি" এলাকায় একবার বেড়াতে গিয়েছিল...! আমি বললাম ওটা "জলের ট্যাঙ্কি" না, "পানির ট্যাঙ্কি"। "জলের ট্যাঙ্কি" ঠিকানায় চিঠি দিলে পিয়ন চিঠি নিয়ে ঘুরবে জায়গা মত পৌঁছাবে না...। কিন্তু মেয়েটি কিছুতে "পানির ট্যাঙ্কি" বলবে না। তার জিভ যেন জলকে পানি বলতে অপারগ!

যারা এই মেয়েটির "গ্রাম্য" পরিচয়ের উপর জোর দিতে চান তাদের বলি, খুবই উচ্চ শিক্ষিত ও কয়েক পুরুষের শহুরে এক ভদ্রলোককে একজন সম্বোধন করেছিল "আরিফ'দা" বলে, ভদ্রলোক আমার সামনে সম্বোধনকারীকে বলেছিলেন, শুনুন, আমাকে দাদা' বা দা 'এরকম কিছু বলবেন না, এসব হিন্দু কালচার আমি পছন্দ করি না...।

যে মেয়েটির কথা বললাম তার পিশতুত ভাই আমার বন্ধু। মেয়েটির নাম অপর্না। যেদিন চলে আসবো তাদের বাড়ি থেকে সে বলল, দাদা, আপনি একদম অন্যরকম, মুসলমান ছেলেদের আমি পছন্দ করি না। ...মুসলমান ছেলেরা ভাল হয় না। আপনি তাদের থেকে আলাদা...।

বললাম, কি করে বুঝলে মুসলমান ছেলেরা সবাই খারাপ?

সে বলল, বুঝি দাদা, আমাদের স্কুলটা যে গ্রামে, সেটা তো মুসলমান গ্রাম, আসতে যাইতে যা শুনতে হয়...।

-বললাম, তোমার বয়েসে কোন মেয়েরই ছেলেদের সম্পর্কে ভাল ধারনা থাকার কথা না। বখাটেগুলো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে এসব করার জন্যই...।

-কিন্তু দাদা আমরা হিন্দু বলে জাত তুলে যা বলে তা আপনাকে বলা যাবে না! ভাবে হিন্দু তো, ওদের বললে কে কি বলতে আসবো? আমার বান্ধবীকে একটা মুসলমান ছেলে খুব জ্বালাতো, এ জন্য ও ওর বাবাকে নিয়া তখন স্কুলে যাইতো, একদিন করছে কি, ওরে ওর বাবার সামনেই গিয়া হাত ধরছে পোলাটা!

মেয়ে মাত্রই এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কম-বেশি যেতে হয়। কত মেয়ে আত্মহূতি দিলো, তাদের বেশির ভাগই তো মুসলিম ঘরের। অর্পনা একচোখাভাবে ব্যাপারটা দেখছে বটে, তবে এটাও ঠিক শুধু হিন্দু হওয়ার জন্য সেরের উপর সোয়া সের হয়। হিন্দু হলে সাহসটা বেশি পাওয়া যায়। "হিন্দু অভিভাবকদের" পাত্তা না দিলেও চলে।...

পরস্পর ঘৃণাগুলো এভাবেই জন্মায়। চরম বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস। কিন্তু আপাত শহুরে তিক্ত সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতাবিহীন সমাজে গোপন, চাপা অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, ঘৃণা তৈরি হয় কিভাবে? অখিল সাহা আর জিন্নাত আলী, এই দুইজন মুরুব্বিকে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। দুজন পরস্পর বাল্য বন্ধু। একই রাস্তার এপাড় ওপাড় দুজনের দোকান। অখিল সাহার দর্জির দোকান, জিন্নাত আলী এ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি-পাতিলের। দুজনেরই অবস্থা ভাল। জিন্নাত আলী পাক্কা হাজি মানুষ। অখিল সাহাও ঠাকুরের নাম নিয়েছেন, সন্ধ্যার পর জপতপ করেন। দুজনরেই বয়স হয়েছে, তবু এখনো এক সঙ্গে বসে দুই বন্ধুতে চায়ের দোকানে হা হা করতে করতে আড্ডা মারেন। একজন আরেকজনের পাত থেকে খাবার তুলে খান। হিন্দু-মুসলমানের এমন

বন্ধুত্ব অসাম্প্রদায়িকতার একটা চমৎকার নজির হয়ে ছিল আমার কাছে। সাম্প্রদায়িকতা দেখতে দেখতে যখন বিষাক্ত হয়ে যেতো মন, বিশ্বাস হারাতো মানুষের উপর, তখন এই দুই বুড়োর বন্ধুত্ব আমাকে দক্ষিণা বাতাসের পরশ দিতো মনে। এই দুজনের ছেলে আবার আমার বন্ধু। এই সুবাদে এদের কাছ থেকে দেখেছি। দুজনের ছেলেই এক সময় আমার ঘনিষ্ঠ সহচর ছিল।

অখিল সাহা আর জিন্নাত আলীর বন্ধুত্বের মার্বেল পাথরের ফলকটা মাটিতে গেঁড়ে বসেছিল গভীর আর অনেক পুরোনো স্থায়ীত্বের জন্য। এই ফলক দেখেই আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। সবাই এই ফলকটাই দেখে। কিন্তু এই চকচকে ফলকটা একদিন সামান্য আলগা হতেই দেখি মাটির গভীরে অন্ধকারে লুকানো কুৎসিত পোকাগুলো কিলবিল করছে! এই সুন্দর ফলকটির অভ্যন্তরে এরা বাসা করে ছিল আপাত সবার অলক্ষ্যে। কোন একদিন হয়ত এরা বেরিয়ে আসতো ফলকটি ভেঙ্গে। মনে আছে একদিন সৈকত ওদের দোকানে আমাকে বসিয়ে রেখে বাইরে গেছে, জিন্নাত কাকা আর অখিল কাকা কথা বলছিলেন। একটু পরে অখিল কাকা চলে যেতেই জিন্নাত কাকা নিচু গলায় এতক্ষণ তাদের সঙ্গে বসে থাকা তৃতীয় একজনকে বললেন, এই মালুগুলি হারামির একশেষ! আমরা মুসলমানরা তো বলদ! অরা ঠিক পয়সা চিপ দিয়া রাখে। হিন্দু কোনদিন মুসলমানের বন্ধু হইতে পারে না ভাই! জীবনে কম তো আর দেখলাম না...।

ঘটনাটা হলো, অখিল কাকার কাছ থেকে টাকা ধার চেয়েছিলেন জিন্নাত কাকা। অখিল কাকা হাতে টাকা নেই বলেও পনোরো দিনের মাথায় জানায় তিনি ইন্ডিয়া যাবেন বিশেষ দরকারে। জিন্নাত কাকার প্রশ্ন, এখন টাকা আসলো কোত্থেকে?

-মালুরা সব টাকায়-পায়সা ইন্ডিয়ায় নিয়া গিয়া রাখে। বুঝেন না এখন ইন্ডিয়ায় যাইতাছে ক্যান?

ব্যস, আমার যা বুঝার বুঝে গেলাম। আবীরের কাছেই একবার শুনেছিলাম, ওর বাবা সব সময় হিন্দুদের সঙ্গে চলতে বলতো ওকে। মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে চলতে মানা করতো। আমার সঙ্গে চলার প্রথম দিকে ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, ছেলেটা কেমন? ওর সাথে এত মাখামাখি করিস কেন? কোন মুসলমানকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। একটাই ছেলে তো, ভয় পেতেন খুব...।

এত ঘৃণা, অবিশ্বাস আর সন্দেহ নিয়ে এই দুই বৃদ্ধ সারা জীবন তাহলে বন্ধুত্বের অভিনয় করে গেছেন? আমার এখনো বিশ্বাস হতে চায় না...।

কিন্তু সৈকতের বড় ভাই যখন স্থানীয় নির্বাচনে নামলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আমার জীবনে সাম্প্রদায়িকতার কুসিৎত চেহারাটা আরো একবার সামনে থেকে দেখার দুর্ভাগ্য হলো। অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও নির্বাচনে আমাকে জড়াতে হলো। বন্ধুর ভাই, সৈকতের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে কথা দিতে হলো এই নির্বাচনে আমি সাধ্যমত খাটার চেষ্টা করবো।

৮০ ভাগ ভোটারই হিন্দু। হিন্দু অধ্যিষুত এলাকা, মূল যে দুজন প্রার্থীর মধ্যে লড়াই হবে তাদের একজন সৈকতের বড় ভাই খুরশিদ আলম। এই লোক যে কি পরিমাণ হিন্দু বিদ্বেষী তার সাক্ষি আমি। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা যতই থাকুক নির্বাচনে তাকে হিন্দু ভোট পেয়েই জিততে হবে। সমিকরণ খুব পরিস্কার, এখানে হিন্দুদের ভোট যে একচেটিয়া পাবে সে-ই জিতবে। খুরশিদ ভাই রানিং কমিশনার। এবার তিনি শক্ত লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। তার মূল প্রতিদ্বন্দি একজন হিন্দু, নিতাই চন্দ্র পাল। খুরশিদ ভাই আগেভাগে স্থানীয় শীতলা মায়ের মন্দিরে মায়ের হাতে একটা রুপার পাখা বানিয়ে দিয়ে এলেন। ঘটা করে সেটা দেয়া হলো। মন্দির পুরোহিতদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলেন, খোঁজ-খবর নিলেন। আশ্বাস দিলেন, তিনি জিতলে মন্দিরের একটা অংশ দোতালা করে দিবেন...।

প্রতীক বরাদ্দের দিন বিড়াট ঝামেলা হলো। খুরশিদ ভাই আর তার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী নিতাই চন্দ্র পাল দুজনই "হাতি" প্রতীক চান। হাতি হিন্দুদের কাছে পূজনীয় প্রাণী। স্বয়ং ইন্দ্রের বাহন সে। এই আসনে পর পর চারবার নির্বাচিত হয়েছিলেন উমেষ রায় নামের একজন যিনি হাতি প্রতীক নিয়ে লড়তেন। উমেষ রায় মারা গেছেন অনেককাল আগে। খুরশিদ ভাই বললেন, হাতি পেলে আমি অর্ধেক নির্বাচন জিতে যাবো...।

আমার মাথায় আসলো না "হাতি" মার্কাটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? এটা কি "পয়া" মার্কা? একজন বলল, তা তো আছেই, তবে হাতি হিন্দুদের কাছে বড় পবিত্র প্রাণী কিনা!

দুদিন পরেই চাক্ষুস দেখলাম সে দৃশ্য। খুরশিদ ভাই হাতি পাননি, আরো একাধিক প্রার্থী হাতি প্রতীক চাওয়ায় লটারীতে নিতাই চন্দ্র হাতি পেয়ে যান। প্রতীক পেয়েই তার লোকজন বিশাল এক হাতি ভাড়া করে আনে নির্বাচনী প্রচারণায়। হাতি বাড়ি বাড়ি যেয়ে সুর তুলে ভোট চায়, আর হিন্দু রমনীরা দলে দলে কুলায় করে ধান-দুব্বা আর সিদুর দিয়ে হাতিকে বরণ করে নেয়! তখন উলু ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে যায় পুরো এলাকাটা...।

দিনকে দিন খুরশিদ ভাইয়ের মেজাজ চড়তে থাকে। আসন্ন পরাজয়কে তিনি চাক্ষুস দেখতে পান। একদিন শুনি নিতাই চন্দ্রর সমর্থকদের মিছিলে হামলা হয়েছে। এই প্রথম আমার মনে হলো, যথেষ্ঠ হয়েছে! আমি জানি এরপর যে নোংরামীগুলো শুরু হবে তা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব না। সেদিনই আমাকে সেরকম একটা নোংরামী চাক্ষুস করতে হলো। আমাদের দলের একটা ছেলেকে কারা যেন মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সে মাথায় হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে কেম্পে এসে আছড়ে পড়ল। আমি আর কয়েকজন চিৎকার করে বললাম, এই রিকশা ডাক, ওকে হাসপাতালে নিতে হবে...। স্বয়ং খুরশিদ ভাই ছিল সেখানে, তিনি থামিয়ে দিয়ে আগে একজন ফটোগ্রাফারকে

তাড়াতাড়ি স্টুডিও থেকে ডেকে আনতে বললেন ওর রক্তাক্ত ছবিগুলো ভাল মত তোলার জন্য!...

কিন্তু সবচেয়ে বড় আঘাতটা পেলাম সৈকতের কাছ থেকে। ওকে আমি এতকাল যা জেনে এসেছিলাম তা এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেলো! ওর মনের ভেতরে এত বিষ জমা ছিল কে জানতো? সৈকত একদিন বলল, আমার ভাই এতকিছু করছে তবু শালার মালাউনগুলি একটা মালাউনরেই ভোট দিবো!...

আমি একটা চপেটাঘাত খেলাম যেন! সৈকতের মুখ দিয়ে এইরকম সাম্প্রদায়িক উক্তি বের হতে পারে আমার ধারনাই ছিল না। রাজনীতি, ক্ষমতা কি মানুষকে এতটা নিচ নামায়? নাকি খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে?

আবীর নিয়মিত আসছিল না বলে সৈকত আবীরের প্রতি ক্ষোভ আর সন্দেহ পোষন করছিল। আমাকে বলল, ও নিতাইয়ের পক্ষে কাজ করছে! বুঝলি না, "হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই"!

আমি হেসে বললাম, যেমন আমি তোর ভাইয়ের জন্য করছি, "মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই"!

ভুরু কপালে তুলে সৈকত জিজ্ঞেস করলো, মানে?

এমন সময় আবীর এসে উপস্থিত হলো।
সৈকত বলল, শালা, ভোটটা তো নিতাইকেই দিবি!

আবীর অবাক হয়ে বলল, ওই শালাকে দিমু ক্যা, ওরে তো চিনিই না। আমাগো বড় ভাই থাকতে নিতাই-ফিতাইরে দিমু কোন দুঃখে?

সৈকত আমার দিকে বিশেষ ভঙ্গিতে চোরা চাহনিতে হাসে। যার মানে, আহারে আমি বুঝি না তুমি কাকে ভোট দিবা...!

এই বিশ্রী পরিবেশটা আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। আমি কোনদিন ভাবিনি আমার বন্ধুদের মধ্যে এই বিষবাস্পটা আসবে। একদিন সকালবেলা গিয়ে শুনি আবীরকে সৈকত কেম্প থেকে বের করে দিয়েছে। আবীরকে সৈকত নিতাইয়ের চর বলে মনে করে। ওদের মিটিং চলছিল, আবীর গিযে বসে থাকায় সমস্যা হচ্ছিল, সৈকত আবীরকে খুবই রুঢ়ভাবে বের হয়ে যেতে বলে...। আবীর আর সৈকতের সম্পর্কটা এভাবেই পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়। আমিও মনে মনে বলছিলাম, "এবার ফিরাও মোরে"! ইলেকশানটা একবার শেষ হোক, আর এ মুখোই হবো না...।

খুরশিদ ভাই খুবই অল্প ভোট পেয়ে হেরে গেলেন। নিতাই যে খুব ভাল লোক তা না। খুরশিদ আর নিতাই কার্বন কপি। তবু হিন্দু বলেই হিন্দুরা তাকে বেছে নিয়েছে! খুরশিদ ভাইকে এই হিন্দুরাই সবচেয়ে বেশি ভোট দিয়ে জিতিয়ে ছিল আগেরবার। খুরশিদ ভাই বেমালুক সে কথা ভুলে গেলেন। আমাকে একজন ফোন করে বলল, হিন্দুপাড়ায় বাড়ি-ঘর আর কিছু রাখে নাই! একবার গিয়া দেখ...

তখনই দেখতে ছুটে গেলাম। দূর্গা ঠাকুরের একটা মন্দির আছে, সেখানে হামলা হয়েছে। গরীব হিন্দুদের উপরই হামলাটা হয়েছে। এসব দেখে আমার কি হবে? আমি কারুর জন্য তো কিছু করতে পারব না। কিন্তু আমিও যে এই ঘটনার একজন ভিলেন, নেপথ্য ইন্দনকারী দলের একজন, তা একটু পরেই জানতে পারলাম। চলে আসবো এমন সময় পিছন থেকে খপ্ করে আমার হাতটা কেউ চেপে ধরলো। চেয়ে দেখি আবীরের বাবা!

আমাকে টেনে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, কি করছ দেখো! আমাদের তোমরা চেনো না? আমার বাড়িতে ঢুকে যেভাবে গালাগালি করছে সেটা শিখায় না দিলে বাইরের

লোক জানবো ক্যামনে? আমার পোলার লগে তোমরা চলো নাই? তার গায়ে হাত উঠলো ক্যামনে তোমাগো!...

-আমি এর কিছুই জানি না কাকা!

-কেউ-ই এখন কিছু জানে না। খুরশিদও বলে সে কিছু জানে না।... কণ্ঠ ভিজে এলো অখিল কাকার। হাত ছেড়ে দিলেন আমার। ঘুরে চলে গেলেন অন্য একটা গলি ধরে।

আসলেই আমরা কেউ কিছু জানি না। এসবের শেষ কোথায়? মানুষের মানুষ হবার গল্প কবে লেখা হবে?

অখিল কাকা আর জিন্নাত কাকা এখনো চায়ের দোকানে বসে একইরকম করে আড্ডা জমান কিনা জানি না। হয়ত জমান। কিন্তু চকচকে মসৃন ফলকের নিচে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা কুৎসিত প্রাণীগুলো প্লেগের জীবাণুর মত হয়ত অপেক্ষায় থাকে কোন একটা উপলক্ষ্যের আশায়... স্রেফ একটা উপলক্ষ্য...

# মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্য নাকি সাংঘর্ষিক

বেশ কিছুদিন আগে মালিবাগ থেকে বাসে উঠেছি, বেজায় ভীড়, পিছনের দিকে একটা জটলা। উঁকি দিয়ে দেখি গ্রাম থেকে আসা এক বৃদ্ধ আর অন্যান্য পেসেঞ্জার-হেলপার বচসা করছে। ভাঙ্গা-ক্ষীণ গলায় বৃদ্ধ বলছে, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা আর মুক্তিযোদ্ধাদের বাস ভাড়া ফ্রি করে দিয়েছে সরকার। কাজেই তিনি ভাড়া দিবেন না। নাগরিক স্বার্থপরতা থেকে সচারচর অন্যের ঝামেলায় নাক গলাই না। কিন্তু এখানে গলালাম, হেলপারকে বললাম, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাড়া ফ্রি হলে তার কাছ থেকে নিবেন কেন? তিনি তো ঠিকই বলছেন। হেলপার বলল, না তো করি নাই, প্রথমে কইলেই হইতো, এমুন চ্যাত্ দেখাইতাছে- জানি দেশ কিন্না ফালাইছে!...

বয়েস ষাট-পয়ষ্টি, ভাঙ্গা শরীরে হাড় গোণা যায় পাঞ্জাবীর ভেতর থেকে। একটা টিনের বাক্স সঙ্গে থাকায় ভীড়ের বাসে বসা নিয়ে পেসেঞ্জারদের সঙ্গে বুড়োর একটু বচসা হয়েছে বোধহয়। হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পেসেঞ্জাররা সেই রেশে এখন টিপ্পনী কাটছে তাকে নিয়ে। একজন অন্যদের বুঝাচ্ছে এমন ভাব করে বলল, উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা! দেশ স্বাধীন করছে!... লোকটার বলার ভঙ্গিতে সবাই হাসছে। সবাই মজা পাচ্ছে। আরেকজন জিজ্ঞেস করলো, কোন সেক্টরে যুদ্ধ করছেন? বুড়ো একজন মেজরের নাম বলল। কোন সেক্টর সে মনে করতে পারে না। বলে, মুখ্যু মানুষ, অতশত তো বুঝি না, ইন্ডিয়া গেছিলাম...। আরেকজন বলল, তেনারা দেশ স্বাধীন করছে- অহন চৌদ্দগুষ্টিরে ধইরা আমাগো তেল মাখতো হইব!... যিনি ক্ষোভ

ঝাড়লেন তার হাতের স্বচ্ছ প্লাস্টিক ফাইল ফুটে স্কুল-কলেজের মার্কশিট-সার্টিফিকেট দেখা যাচ্ছে। চাকরি প্রার্থী বা সদ্য ছাত্রত্ব শেষ করেছেন সম্ভবত। আমার মনে পড়ে গেলো শাহবাগে বিসিএস'এর কোটা বিলোপের আন্দোলনের কথা। কোটা নিয়ে আমরাও সমালোচনা করেছিলাম। প্রকৃত মেধাবী যেন কোটায় কাটা পড়ে হারিয়ে না যায়। কিন্তু শাহবাগে আন্দোলনরতরাসহ বিসিএস প্রার্থী, তাদের অভিভাবকরা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যে কি পরিমাণ বিষেদাগার করেছেন তার ভাষা এই লেখায় প্রকাশ করা যাবে না। ন্যূনতম শ্রদ্ধা, দেশ স্বাধীন করা সৈনিকদের প্রতি মিমিনাম রাখঢাগ রাখার কোন চেষ্টাই কেউ করেননি। বরং মনে হয়েছে একটা চাপা ক্ষোভ, অবজ্ঞা, আবেগহীনতা একটা উপলক্ষ্য পেয়ে আজ প্রকাশ পেয়ে গেছে। স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর বাংলাদেশ করা নিয়ে জনগণের একটা বিপুল অংশ দ্বিমত না হলেও আবেগহীন, "ভারতের ষড়যন্ত্রের একটা ভূমিকা ছিল" জাতীয় তত্ত্ব বিশ্বাস করে। শাহবাগের তখনকার আন্দোলনকে অনেকেই জামাত-শিবির ঢুকে গেছে বলে দাবী করেছিল। হতে পারে, তবে সাধারণ ছাত্ররাই তো সেখানে ভীড় করেছিল। আর তাদের পুরো ক্ষোভটাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি। ভাবুন একবার, দেশ স্বাধীন হবার ৪৩ বছর পর যে কোন কারণেই হোক, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে এমন মানুষ ও তাদের পরিবার সকলের রোষের শিকার হয়েছেন! শাহবাগের আন্দোলনের সবাই জামাত-শিবির ছিল না। সবাই রাজাকারের সন্তান ছিল না। যেমন বাসের যাত্রীদের সবাই রাজাকারদের সন্তান হতে পারে না। "উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা"- এটা এখন আর কোন হিরোটিক ইমেজ আনে না আমাদের মধ্যে। নানাবিধ কারণ আছে এর। বহু মুক্তিযোদ্ধার লেখা বই পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কিত করে ফেলেছে। মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধার মাংস খেয়েছে। কাদের সিদ্দীকির দ্বিতীয় জন্ম হয়েছে। ইতিহাসের একটা বাঁকে জিয়াউর রহমানের উদয় "মুক্তিযোদ্ধা" শব্দটিতে বার বার বিব্রত হতে হয়েছে জাতিকে।... অসংখ্য কারণ থাকতে পারে আজকের মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধা ইমেজ হারিয়ে যাওয়া নিয়ে কিন্তু এই লেখা সেই কারণ উৎঘাটন করার লক্ষ্যে নেই। আমরা বরং দেখাতে চাই ৪৩ বছর পর যুদ্ধাপরাধীদের

প্রতি জনগণের একাংশের সহানুভূতি ও বাংলাদেশী জিহাদী তথা মুজাহিদদের মুসলিম বিশ্বে গিয়ে "মুক্তিযুদ্ধে" অংশ গ্রহণ পরবর্তী "শহীদ", "গাজী" খেতাব পাওয়ার বাস্তবতা। কেমন হবে সামনের দিনগুলোতে এই "শহীদ" আর "গাজী" খেতাব পাওয়াদের সমান্তরালে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে "শহীদ" ও "বীর প্রতীক" "বীর উত্তম" খেতাবধারীরা? অন্তত ২০ বছর পর? ৫০ বছর পর?...

সঠিক পরিসংখ্যান নেই তবু জানা যায় আফগান-সোভিয়েট যুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য একটা সংখ্যা মুজাহিদ হয়ে সেই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীদের সঙ্গে শামিল হয়। যুদ্ধে বাংলাদেশী জিহাদীরা শহীদ হয়েছে অনেকে। যারা "গাজী" হয়েছেন বেঁচে গিয়ে তারা পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসে নানা রকম ইসলামী সংগঠন গঠন করে। যুদ্ধ ফেরত এইসব মুজাহিদ তাদের ইসলাম প্রচারে বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য পেতে থাকে। দল সংগঠিত হতে থাকে। বলতে গেলে সবার অলক্ষ্যে মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে কর্মী সংগ্রহ হতে থাকে। এটা শুরুর কথা। তবে এই বিষয়ে আমি গবেষক নই। আমার লক্ষ্যও কেমন করে জঙ্গিবাদ ডালাপালা মেললো সেটা না। কাজেই আমি ফিরে যাই আমার লেখার মূল লক্ষ্যে- "৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ" বনাম "ধর্মযুদ্ধে শহীদ"- "বীর শ্রেষ্ঠ-বীর উত্তম-বীর প্রতীক" বনাম "গাজী-মুজাহিদ"!

প্রথম ও প্রধান ফ্যাক্টই হচ্ছে বাংলাদেশ পাকিস্তান নামের একটা ইসলামী দেশ ও মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে! তুলনা করুন, আরব বিশ্বের কোন মুসিলম দেশ জাতিগত কারণে যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়ে গেলো- যে পক্ষটি উদার-ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে স্বাধীন হবে মুসলিম বিশ্ব কি তাকে ভাল চোখে দেখবে? তাদের চোখে তো এটা মুসলিমদের "কমজোরি" করার নামান্তর! তার উপর ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র বলে ইসলামিজমকে ঝেড়ে ফেলে দেয়া। খোদ এইরকম কোন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জনগণ পরবর্তীতে "কওমের বিরুদ্ধে যাবার" হীনমন্যতায় ভুগে! "মুসলিম একটা জাতি" যতই বায়ুবীয়ই হোক- মুসলিম মাত্রই সেটাতে একাত্ব অনুভব করে। বাংলাদেশ যদি ভারত থেকে পৃথক হতো- রেসকোর্সে

যদি ভারতীয় বাহিনীর প্রধান অররা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর প্রধানের কাছে বা মিত্র বাহিনী পাকিস্তানের প্রধানের কাছে আত্মসমর্পন স্বাক্ষর করতো- তাহলে ১৬ ডিসেম্বর হতো আমাদের আরো একটি ঈদের দিন! এটি যতদিন স্বীকার করতে পারবেন না ততদিন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের মৃয়মাণ আবেগের আসল কারণ কোনদিন অনুসন্ধান করতে পারবেন না...।

বাংলাদেশের ৭১-এ শহীদ পরিবারগুলো আমার নিজের ধারনা ৭৫ পরবর্তী দেশের মানুষের আবেগ ও সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে। "পাকিস্তানই ভাল ছিল"- এইরকম একটা আত্মসমালোচনা বাজারে ছড়ানো হলে পাবলিক ভালই খেয়েছিল। মুজিব বিরোধীতার হালে পানি পেতে হলে এই ফিবার না ছড়িয়ে উপায় নেই। আর সেই ফিবার থেকে জন্ম নিল বিএনপি। মুক্তিযুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে মারতে হবে! মুক্তিযোদ্ধার শত্রু হলেন মুক্তিযোদ্ধা! এই সুযোগে ঘাতকরা তাদের আহত থাবা চাটতে লাগলো। ৯০-এ গোলাম আযমের ফাঁসি দাবীতে শহীদ জননী জাহানারা ঈমামের নেতৃত্বে যে গণআদালত গড়ে উঠে ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে গোলাম আযমের ফাঁসি চাইলে "রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা" খেতে হয়। কিন্তু তারচেয়েও কঠিন সময় পড়ে ছিল ২০১৩ সালে। শাহবাগে রাজাকারের ফাঁসির দাবীতে জনসমাবেশের পাল্টা মতিঝিলে হেফাজতের জনসমাবেশ গোটা জাতিকে বুঝিয়ে দিলো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এখন "বাংলাদেশী ইসলাম"!

কথাটিতে কি কোন ভুল আছে? আমরা বললাম, কাদের মোল্লার ফাঁসি চাই! পাল্টা ওদিক থেকে আওয়াজ এলো, নাস্তিকদের ফাঁসি চাই! নাস্তিকের সঙ্গে ধর্ম সম্পর্ক আছে। নবী অবমাননার সঙ্গে ধর্ম প্রাসঙ্গিক। কাদের মোল্লার ফাঁসি চাইলে ধর্ম আসে না, ইসলাম আসে না। তবু এসে গেলো। যারা এই দেশে আমাদের ইসলামের সবক দেন তারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তারা বললেন, এরা নাস্তিক, নবী অবমাননাকারী। রাজনীতিবিদরা বললেন নষ্ট ছেলের দল! ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে কাউকে সমর্থন করা হবে না...। শাহবাগে আমরা মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগান দিলাম, গোলাম

আযম-সাঈদী-কাদের মোল্লার ফাঁসি চাইলাম- এর মধ্যে ইসলাম বিরোধীতা আসলো কোত্থেকে? আসে নাই। তবে যতবার মুক্তিযুদ্ধকে ফিরিয়ে আনবেন- ততবার আপনার বিরুদ্ধে ইসলামকে ফিরিয়ে আনা হবে। তাই আগামীদিনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হবে ইসলাম! যেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলামকে আনা হয়েছিল প্রতিপক্ষ হিসেবে। তখন সেই চাল কাজ করেনি। বাঙালী জাতীয়তাবাদের কাছে সাময়িকভাবে মুসলিম জাতীয়তাবাদ মার খেয়েছিল। তবে সেটা ১৯৭১ সাল আর এটা ২০১৪। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আর আজকের এই সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে সিরিয়া বা ইরাকে ধর্মযুদ্ধে যেয়ে শহীদ হওয়া বাংলাদেশী মুজাহিদদের পরিবারকে পাড়া-মহল্লায় গর্বের চোখে দেখা হবে না? এই ছেলে মুসলমানের টানে, ইসলামকে ভালবেসে যুদ্ধে গিয়ে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে- এই বলে যখন তার চল্লিশার দিনে মসজিদের মিলাদে বা জুম্মার খুতবায় ঘোষণা করা হবে তখন সেটা আর জঙ্গিবাদ থাকবে না।

যারা "গাজী" হয়ে বাড়ি ফিরবেন, সেই বীর মুজাহিদকে নিজ এলাকার মসজিদের ঈমান সাব যখন পরিচয় করে দিবেন- ইনি আমাদের সেই ভাই যিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবন বাজি রেখে লড়েছেন- তখন তার ইমেজ খবরের কাগজে ছাপা বোমাসহ জিহাদী আটকের মত ইমেজে পড়বে না। "বীর উত্তম" "বীর প্রতীকরা" বহু আগেই রাজনীতির কারণে নিজেদের খেতাবের আক্ষরিক অর্থ হারিয়েছেন। জনগণ এইসব বীরদের বীর ভাববে কেমন করে যখন মুক্তিযুদ্ধটাকেই তারা আবেগহীনভাবে গ্রহণ করতে শিখেছে? বরং তাদের মধ্যে যে ধর্মের আবেগ বর্তমান, ইসলামের যে তেজ, মুসলমানিত্বের যে গর্ব বিরাজমান- তাতে একজন মুজাহিদকেই তাদের কাছে হিরো মনে হবে।

এসব স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমশ। সম্প্রতি আল কায়দা যে ভিডিও বার্তা প্রদান করেছে তাতে বাংলাদেশ, ভারতসহ উপমহাদেশে তাদের শাখা খোলার ঘোষণা দিয়েছে।

ভারতে এ নিয়ে তোড়পাল শুরু হয়ে গেছে। দেশে রেডএলার্ট জারি করা হয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ইরাকে-সিরিয়ায় আইএসের কাছে টিকতে না পেরে আল কায়দা উপমহাদেশের দিকে নজর দিয়েছে। তা দিক, আইএস আর আল কায়দা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি হতে পারে। ডিস্টিবিউটরশীপ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া থাকতেই পারে। তবে আমাদের মধ্যে আল কায়দার শাখা খোলা নিয়ে ন্যূনতম উৎকণ্ঠা, আতংক জাগতে দেখিনি। আমরা এক প্রকার তাদের সাদরে গ্রহণ করতে অবচেতনে হলেও কি তৈরি নই? আল কায়দা মোটেও বাংলাদেশে অজনপ্রিয় নয়। তাদের প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন বাংলাদেশে। বাংলাদেশে তার ছবি সম্বলিত পোস্টার, ক্যালেন্ডার বিপুল বিক্রিত ছিল। খোমেনী, সাদ্দাম হোসেনের ছবি বিক্রির সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল তখন বিন লাদেনের ছবি। টুইন টাওয়ার ভাঙ্গার পর যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতিতে ধস নামে। বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বহু দোকানপাট মন্দায় বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলাদেশী শ্রমিকদের চাকরি ছাটাইয়ের একটা ঢল নামে সেসময়। হাজার হাজার শ্রমিক চোখের পানি ফেলে দেশে ফেরে সর্বস্ব হারিয়ে। তখন ওসামাকে দায়ী মনে করা হয় এই অর্থনীতি বিপর্যস্ততার জন্য। বলা হয় এটা আল কায়দার হটকারীতা। পেটে লাথি খেলে সবারই লাগে। স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ্যে ওসামা বন্দনায় ভাটা পড়ে যায়। তবে তলের প্রেম ঠিকই বজায় থাকে। বাংলায় প্রবাদ আছে- মেরেছো কলসির কোনা, তাই বলে কি প্রেম দিবো না!... আল কায়দার সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে তাই এদেশের মানুষ "আমেরিকার ষড়যন্ত্র" হিসেবেই দেখে। জঙ্গি তৎপরতাকে ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদীদের লাগাতার অপপ্রচার বলে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশে যখন বাংলা ভাই, শায়খ আবদুর রহমান উত্থান শুরু হয় তখনো জনগণের মধ্যে তাদের প্রতি চাপা সহানুভূতি ছিল। এদেশের মানুষ প্রকাশ্যে শিরোচ্ছেদকে বিচারের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম বলে মনে করে। লোকজন কথায় কথায় সৌদি আরবে চুরি করলে হাত কাটার মত শাস্তিকে গর্ব করে উল্লেখ করে। কয়েক মাস আগে এক মন্ত্রীও ইসলামী শাস্তি মতে

শিরোচ্ছেদের কথা বলেছিলেন। মদিনা সনদের কথা প্রায়ই রাজনীতিতে শোনা হয়। এসব বিবেচনায় জনগণ আল কায়দাকে নিরব স্বাগত জানাবে বলেই মনে হচ্ছে ।

তো কি দাঁড়ালো? ইসলামকে দাঁড় করানো হবে আমাদের সমস্ত ইতিহাস, ঐতিহ্য আর গর্বের জায়গাগুলোতে। আপনি আমি না চাই, যারা এই দেশের ইসলামের ডিস্ট্রিবিউটর তারা ইসলামকে খাড়া করবেই। শাহবাগে ইসলাম আমাদের প্রতিপক্ষ হয়েছিল। ভবিষ্যতে যে কোন মানবতাবাদী আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের ইতিহাসকে ইসলামের প্রতিপক্ষ করে খাড়া করা হবে। মদিনা সনদ অনুসারে যে দেশ চলবে বলে অঙ্গিকারবদ্ধ, কুরআন-সুন্নার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন আইন বাস্তবায়ন না করার শপথ নেয়া দেশ ইসলামের খেলাফতের ডাককে কেমন করে গ্রহণ করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।...

# বাঙালী মুসলমানের রাজনৈতিক পরিচয়:
# অনেক সূত্রের যোগফল

১.

হাজি শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের ঈদের নামাজ ও জুম্মার নামাজ পড়তে নিষেধ করেছিলেন কারণ ইসলামী মতে কাফেরদের দেশে মুসলমানদের জন্য ঈদের ও জুম্মার নামাজ পড়া নিষেধ। আজকে আইএস ঈদের নামাজ পড়তে নিষেধ করে ঠিক একারণেই। ইসলামী মতে পৃথিবীটা দারুল হরব (কাফের শাসিত)- একে দারুল ইসলাম (মুসলমানদের দেশ) না করা পর্যন্ত মুজাহিদদের জন্য ঈদ জুমার নামাজ পড়া হারাম। শরীয়তুল্লাহ'র ফরায়েজী আন্দোলনে এরকমই হাজারো ফরজ কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হতো মুসলমানদের...। তাই যৌক্তিক প্রশ্ন উঠতেই পারে,- ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে কেমন করে 'ফরায়েজী' আন্দোলনকে অন্তর্ভূক্ত করা হলো? আমরা আমাদের শৈশবে 'ফরায়েজী আন্দোলন' 'বাঁশের কেল্লাকে' ইতিহাসের বইতে পড়েছিলাম ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের ফরজ নিয়মগুলো প্র্যাক্টিসিলি প্রতিষ্ঠার জন্য হাজি শরীয়তুল্লাহ ১৮৮৮ সালে যে আন্দোলন শুরু করেন তাকেই 'ফরায়েজী' নামে ডাকা হয়। শরীয়তুল্লাহ ভারতকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেছিলেন। ইসলামে জিহাদে কাফেরদের অঞ্চলগুলোকে দারুল হরব বলা হয় যেখানে জিহাদ করে মুসলমানরা দারুল ইসলাম অর্থ্যাৎ মুসলমানদের দেশ বানাবে। শরীয়তুল্লাহ'র এই রাজনৈতিক বিশ্বাস কেমন করে তাকে

ভারতের মূল স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্তর্ভূক্ত করবে? সন্দেহ নেই তখন ইংরেজরা ক্ষমতায় ছিল বলে শরীয়তুল্লাহর জিহাদটা ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে গিয়েছিল।

২.

শরীয়তুল্লাহ মারা যাবার পর তার পুত্র দুদু মিয়া এরপর ফরায়েজী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। এ সময় দুদু মিয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটে নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের সঙ্গে। ১৮৮৭ সালে তিতুমীর হজ শেষে ভারতবর্ষে ফিরে এসে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজ নীলকর ও বর্ণবাদী হিন্দু জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলেন। এসব কারণে তিতুমীরকে অনায়াসে ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা হিসেবে দেখানো যেতোই। কিন্তু তিতুমীরের স্বপ্ন ছিল মুসলমানদের ঈমান ও আমলের হেফাজতের কল্পে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা। সেই লক্ষ্যে তিতুমীর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, ফরিদপুরের কিছু অংশের জমিদারকে পরাস্ত করে দখল করে নেন। তারপর সেখানে স্বাধীন শরীয়তপন্থি ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। তিতুমীর স্থানীয় বাঙালী মুসলিমদের ঐসব উৎসব অনুষ্ঠান বর্জন করতে ফতোয়া দেন যেগুলো কুরআন-সুন্নায় অনুমোদন নেই। অর্থ্যাৎ তিতুমীর আজকের পহেলা বৈশাখকে হিন্দুয়ানী বলাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন বা তিনিই বাঙালী মুসলমানকে ধর্মের প্রশ্নে কট্টর করে তোলার কারিগর। মুসলমানদের জন্য দারুল ইসলামের কথা যিনি ভেবেছিলেন তিনি কি করে ভারতবর্ষের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হোন?

৩.

ইংরেজদের আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও সমরনীতির কাছে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা দুঃস্বপ্নের মত ধসে যায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ও পরবর্তীকালে তিতুমীরদের ব্যর্থতায় বহু ফরায়েজী মুজাহিদকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। নেতা গোছের লোকজন মক্কায় গিয়ে আশ্রয় নেন বা আশেপাশে সীমান্ত অঞ্চলে। অনেকেই ইংরেজ আইনে দোষী প্রমাণিত

হয়ে কারাগারে নিক্ষেপ হয়। জিহাদের বাস্তবতা উপলব্ধি করে এরপর ফরায়েজীরা সিদ্ধান্ত নেন সশস্ত্র যুদ্ধের ধারা স্থগিত করে আপাতত ইসলামী চেতনার মুসলিম যুবকদের তৈরি করাই হবে ভবিষ্যত ইসলামী শাসনের ক্ষেত্র। ইংরেজদের প্রণিত পাঠ্যসূচী মুসলিমদের ইসলামী চেতনা অর্থ্যাৎ ইসলামের রাজনৈতিক অভিলাষ থেকে সরিয়ে ফেলতে পারে এই আশংকায় এ সময় 'দারুল উলুম দেওবন্দ' প্রতিষ্ঠা হয় ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে। এর মূল লক্ষ ছিল এখানে মুসলিম যুবকরা নানা বিষয়ে শিক্ষা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের রাজনৈতিক লক্ষের প্রতি সচেতন থাকা। দেওবন্দের ছাত্র-শিক্ষকরা নানা সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা স্বীকার করেছেন। এ কারণে ইংরেজ আমলের শেষদিকে আমরা দেখতে পাই দেওবন্দ ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড। ১৯০৯ সালে শাইখুল হিন্দ তার একনিষ্ঠ ছাত্র মাওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধিকে দিয়ে 'জমিয়তুল আনসার' নামের এক মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলেন। 'জমিয়তুল আনসারের' লক্ষ ছিল তূর্কী আনোয়ার পাশার সঙ্গে চুক্তি করে তুর্কী বাহিনী আফগান হয়ে ভারতবর্ষ আক্রমন করলে স্থানীয় মুজাহিদরাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করবে।... এসব কর্মকান্ড যে ইংরেজদের ভারত থেকে বিতারণের সংগ্রাম ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি বিশেষ ধর্মীয় শাসন ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষে যে আন্দোলন তা আসলে কাদের স্বাধীন হবার কথা বলে?

**৪.**

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তুরস্কের খেলাফত ও তাদের খলিফাকে নিজেদের খলিফা বা শাসক দাবী করে ভারতীয় মুসলমানরা 'খিলাফত' আন্দোলনের ডাক দেয়। এ যেন ১৮৮৮ সালের 'ফরায়েজী' আন্দোলনের মতই একটি আন্দোলন তবু এর মননে বেশ তফাত রয়েছে। ফরায়েজী আন্দোলনকে যদি প্যান ইসলামিক বলা যায় তো খিলাফতকে জাতীয়তাবাদ বলতে হয়। মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার ফলে যে আধুনিক মুসলিম সমাজের সূচনা শুরু হয়েছিল, দেওবন্দী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত

মুসলিমদের থেকে যারা পোশাকে, চেহারায় ভিন্ন সেই তারাই খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে বা সমর্থন করে ভারতীয় মুসলিমদের আত্মপরিচয়কে ফের ঘোলাটে করে ফেললেন। ভারতের অমুসলিম প্রগতিশীল সেক্যুলাররা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কোথাকার কোন তুরস্কের খলিফা কি করে ভারতীয়দের শাসক হন? মৌলানা আবুল কালাম আজাদ খেলাফত আন্দোলনকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কংগ্রাসের রাজনীতিতে থেকে গেলেও বেশির ভাগ মুসলিম নেতারা তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য মুজাহিদ পাঠানোর অঙ্গিকার করে এবং ভারতবর্ষে ইংরেজদের বিতাড়িত করে ইসলামী খিলাফত গঠন করার লক্ষ্যে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' গঠন করেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকে। মহাত্মা গান্ধি খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন মুসলিমদের ইংরেজ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত করার আশায়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি বড় রকমের ভুল। এর মাধ্যমে ধর্মের প্রশ্নে দেশভাগের রাস্তা খুলে দেয়া হয়। যাই হোক, তুরস্কের খিলাফতকে বাতিল করে এ সময় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হোন প্রগতিশীল তুরস্কের জনক কামাল পাশা। ভারতীয় মুসলমানরা এবার দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল খিলাফতের সমর্থক আরেক দল যারা প্রগতিশীল বাঙালী মুসলমানদের প্রথম পুরুষ তারা কামাল পাশার সমর্থক। বাঙালী মুসলিম প্রগতিশীলদের প্রথম পুরুষদের একজন সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ লিখেন- "মুসলমান-জগতের, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের, আবেদন-নিবেদন, কান্না-অভিমান, হুঙ্কার আর আস্ফালন, যখন এক বিদ্রুপের চেহারা নিয়ে জগতের শক্তিমানদের সভায় মনোরঞ্জনের কার্যে ব্যাপৃত ছিল, তখন একদিন কামালের বজ্রহস্তে উদ্যত হলো তাঁর জন্মভূমির এককোণে নিরালায় শাণিত তলোয়ার। সেবারকার মতো শক্তিমানদের আরাম আর কৌতুকের উপর যবনিকা পতন হলো; আর মুসলমানজগত বিস্ময়, পুলক, আর তারীফের বন্যায় দিকহীন লক্ষ্যহীন হয়ে ভাসতে লাগলো। আমাদের তরুণ কবির সেদিনকার যে প্রাণময় উচ্ছ্বাস– 'কামাল তু

নে কামাল কিয়া ভাই!' সেদিন ঐ-ই ছিল আমাদের সকলেরই অন্তরের অন্তরতম কথা"।

**৫.**

কবিতাটি লিখেছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। আধুনিক উদার মুসলিম সমাজের পথিকৃতরা কেন প্যান ইসলামপন্থিদের অনুরূপ 'মুসলিম উম্মাহ' রোগে আক্রান্ত সে এক বিব্রতকর প্রশ্ন। এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ থেকে দেশবন্ধু সকলের মনেই এসেছিল বৈকি। শরৎচন্দ্র তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন এই বিপুল সংখ্যক ভারতীয় মুসলিমদের চিন্তার জগত নিয়ে দুর্ভাবনায় দেশবন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি হিন্দু-মুসলমান ইউনিটি বিশ্বাস করেন? শরচৎচন্দ্রর উত্তর- না। দেশবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, কিন্তু এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারেন? এরিমধ্যে তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে গেছে। আর দশ বছর পর কি হবে বলুন তো? ... দেশবন্ধুর মনে কি ভাবিকালের দেশভাগের একটা চিত্র খেলে গিয়েছিল? আজকের ধর্মীয় হানাহানিতে রক্তাক্ত উপমহাদেশ কি তার মাসননেত্রে ভেসে উঠেছিল? রাজনীতিবিদরা নাকি ভবিষ্যতদ্রষ্টা হয়ে থাকেন। অনেকদূর পর্যন্ত তারা দেখতে পান...। কোথাকার কোন মধ্যযুগীয় শাসনের একজনকে নিজেদের শাসক বলে স্বীকার করাটা ছিল ভারতীয় হিসেবে গ্লাণিকর। এমন কি কমাল পাশার মত প্রগতিশীল কেউ তুরস্কের দায়িত্ব ভার নিলেও তার নামে নেচেগেয়ে উল্লাস করাটা কতখানি প্রীতিকর ছিল? ভারতীয় মুসলমান তো ভারতীয় হিন্দুর মতই এই মাটির সন্তান। তাহলে কেন এই হীনমন্যতা? নিরোদ সি চৌধুরী কোলকাতার রাস্তায় হারমনিয়াম বাজিয়ে মুসলিম যুবকদের নজরুলের লেখা কামাল পাশা কবিতাকে সুর করে গাওয়া নিজের চোখে দেখেছিলেন তার জানালা থেকে। তিনি সে সম্পর্কে লিখেছিলেন, "১৯২২ সালে মোস্তফা কামালের বিজয়োপলক্ষে রচিত নজরুলের একটি কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে মুসলমানদের একটি শোভাযাত্রা যাইতেছিল। আমি তাহা ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটে আমার বাসার জানালায় দাঁড়াইয়া উপর হইতে

দেখিতেছিলাম। দেখিয়া আমার কি রকম ঘৃণা যে হইয়াছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না...”।

**৬.**

ভারতবর্ষ ভাগ হলো। ধর্মীয় পরিচয়ে পাকিস্তান নামক ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও অবিভক্ত ভারতের অবাঙালী মুসলিমরা ‘পাকিস্তানের’ বিরোধীতা করলেন। এই বিরোধীতা বলা বাহুল্য সেক্যুলার কোন চিন্তা থেকে ছিল না। পাকিস্তানে তাদের জাতিগত পরিচয়ে সংখ্যালঘু হয়ে যাবার ভয়ে তারা পাকিস্তান চাইছিল না। কিন্তু পূর্ব বঙ্গের বাঙালী মুসলমান পাকিস্তান প্রশ্নে অনুষ্ঠিত গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে রায় দিল। কোটি কোটি মানুষের চোখের জলে, বুকের তাজা রক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হল পাকিস্তান। ‘বাঙালী মুসলমানের’ ধর্মীয় পরিচয়ে রাষ্ট্র গঠনের এ এক অনন্য ইতিহাস! অস্বীকার করার উপায় নেই বাঙালী মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষে তার রায় দিয়ে প্রমাণ করেছিল সে আদতে মুসলমান, এই পরিচয় তার কাছে অনেক বেশি বাস্তব। কিন্তু পাকিস্তান ধর্মীয় পরিচয়ে গঠিত হবার পরও পাকিস্তানের ধর্মীয় নেতারা অসন্তুষ্ঠ রয়ে গেলো। তাদের কাঙ্ক্ষিত ‘ইসলামী শাসন’ মুসলিম লীগ পূরন করতে ব্যর্থ হয়েছে এই মর্মে তারা ক্ষোভ জানাতে থাকল। যে কারণে তারা মুসলিম লীগ থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে ১৯৫১ সালে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েমের লক্ষে ‘নেজামে ইসলাম’ বা ইসলামী শাসনতন্ত্র পার্টি গঠন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মাওলানা ভাষানীর ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ’ ও শেরেবাংলার ‘কৃষক প্রজা পার্টির’ সঙ্গে নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে জয় লাভ করে। সেক্যুলার বলে পরিচিত ভাসানী-শেরে বাংলা কেমন করে ইসলামী শাসনতন্ত্র চাওয়া একটা গোঁড়া ইসলামী দলের সঙ্গে জোট করেছিল? ১৯৫৩ সালেই এই জমিয়ত নেতৃবৃন্দ ‘খতমে নবুয়ত’ নামের আন্দোলন তীব্র করে তোলে আহমদিয়া গোষ্ঠিদের অমুসলিম ঘোষণা করতে। ভয়াবহ দাঙ্গার সৃষ্টি করে শত শত মানুষকে ধর্মীয় পরিচয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার জেরে জমিয়ত নেতা মাওলানা বোখারী,

মাওলানা হাজারভি ও জামাত ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদুদির বিচারে ফাঁসি রায় হয়েছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে জমিয়ত ও জামাত প্রতিষ্ঠাতা মওদুদির পক্ষে নিজ খরচে আদালতে লড়ার জন্য আওয়ামী লীগের প্রবাদপুরুষ হোসেন শহীদ সোহরাওর্দী লাহোর চলে যান। মুসলিম বিশ্বের নেতাদের বিরোধীতার কারণে মওদুদিসহ অন্যদের ফাঁসি রায় মওকুফ হয়ে যাবজ্জীবন সাজা বহাল হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করলে সেই যাবজ্জীবন সাজাও বাতিল হয়ে যায়। বুঝায় যাচ্ছে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য ধর্মাশ্রয়ী দলের সঙ্গে কি ধরণের লেনদেন হয়েছিল। দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরহ মানুষের রক্ত যাদের হাতে লেগেছিল তারা সবাই জেল থেকে বীরের মত বের হয়ে আসল...।

**৭.**

বাঙালী মুসলমান দেখা যাচ্ছে বরাবরই দুটো ভিন্ন ধারায় তাদের রাজনৈতিক তথা রাষ্ট্রীয় চিন্তা ধারণ করে আছে। কিন্তু কতখানি দুরত্ব ছিল তাদের সেই রাজনৈতিক ভিন্নতায় তা উপরে আলোচনায় আশা করি সংক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। বাঙালী মুসলমান 'অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র' নির্মাণ করেছিলো ১৯৭১ সালে- এটি আজকে বড় ধরণের বিতর্ক হয়ে উঠেছে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় আচরণের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হবার পর 'বাংলাদেশ' কাগজে-কলমে 'মুসলিম দেশ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে ওআইসিতে যোগদান ছিল বর্হিবিশ্বের সেক্যুলার রাষ্ট্রগুলোর কাছে একটি হতাশা। এম আর আখতার মুকুল পশ্চিমবাংলায় শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অস্থায়ী সরকারের হয়ে কাজ করছিলেন। এক অনুষ্ঠানে তিনি একদা ধর্মের পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'মনে রাখবেন আজকে আমরা যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দান করছি তাদের অনেকেই এই কলকাতা শহরেই বছর পচিঁশেক আগে 'হাত মে বিড়ি মু মে পান, লড়কে লেংগে পাকিস্তান' করে গেছে। তারাই আবার পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ করার জন্য একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। কিন্তু কেন?...' এর

জবাবে মুকুল তার বালক বয়েসে হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে মুসলিম পরিচয়ে অপমানিত হওয়ার গল্প শোনানো ছাড়া আর কোন বড় রকমের যুক্তি দেখাতে পারেনি। তারপরই মুকুল পাকিস্তান গড়ার চেতনার যৌক্তিকতাই যেন ফের মনে করিয়ে দিতে বললেন, '...বাংলাদেশের এই ভয়াবহ দুর্দিনে আপনারা আশ্রয় দিয়েছেন-আপনজন ভেবে কাছে টেনে নিয়েছেন। এ জন্য আপনাদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে আপনারা যারা সাতচল্লিশ, পঞ্চাশ, আটান্নো, বাষট্টি কিংবা পয়ষট্টি সালে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এসেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আবার তারা এককালের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারবেন...।...বাস্তব ক্ষেত্রে যা ঘটতে যাচ্ছে, সেই নির্মম সত্য কথাটা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলাম। অলীক স্বপ্ন দেখলে মানসিক যন্ত্রণাই বৃদ্ধি পাবে।...' ... ১৯৪৭ সালে দেশভাগে এপার-ওপার যাওয়া মানুষের না হয় একটা 'বৈধতা' ছিল, কিন্তু যারা পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিল সংখ্যালঘু হিন্দু হিসেবে তারা ৫০, ৫৮, ৬২, ৬৫ সালে বাধ্য হয়েছিল দেশত্যাগ করতে, শত্রু হিসেবে যাদের সম্পত্তি দখল হয়েছিল সরকারী নির্দেশে তাদের অপরাধটা কি এম আর আখতারের কাছে? আশ্চর্য যে ভারতের শরণার্থী থেকে, মুক্তিযুদ্ধে তাদের সহযোগিতায় থেকে, বিপুল সংখ্যক পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত বাঙালী হিন্দুদের সহযোগিতায় আশ্রয় পাওয়া মুকুল যেন বললেন, মনে রেখো তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন নৈকট্য নেই। ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালীর ঐক্য এক অলীক স্বপ্ন?... কোলকাতার রাস্তায় কামাল পাশার বিজয়ে উল্লসিত মুসলিম যুবকদের মিছিলকে নিরোদ সি চৌধুর কাছে 'ঘৃণ্য' লেগেছিল। কিন্তু কোলকাতার শ্যামবাজার নাট্যশালার হলঘরে মুকুলের বক্তৃতা শুনে উপস্থিত শ্রোতাদের কেমন লেগেছিল জানা যায়নি...।

# শরৎচন্দ্র ও সমকালীন হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি লিট উপাধি প্রদান করেছিলো ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। অথচ নিজে বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাক, কোন মতে স্কুলের গন্ডি পেরিয়েছিলেন মাত্র। সেই তাকেই যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি লিট প্রদান করলো, সাহিত্য কাগজ 'শনিবারের চিঠি' পরিহাস করতে ভুলেনি। 'অশিক্ষিত' ভেবে তার লেখাকে যারা খেলো ভাবত তাদের মুখে চুনকালি পড়েছে'-শনিবারের চিঠি তার নিজস্ব ঢংয়ে এভাবেই প্রকাশ করেছিল। ধর্ম, সমাজ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, লোকাচারকে চাবুক মেরে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলা এই মানুষটি তার সময়ে ছিলেন প্রথাবিরোধী। তার লেখা পড়ে কুলিন বংশ গৌরব আঘাত প্রাপ্ত হতো। সমাজ 'রসাতলে' চলে যেতো। অন্তপুরের নারীরা তার লেখা পড়লে বেশ্যা হয়ে যাবে। তার লেখায় হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা বিশ্বাস আর অনুভূতি প্রবলভাবে কেঁপে উঠেছিল বলে অশিক্ষিত ধার্মীকই শুধু নয়, সমসাময়িক লেখক সুশীল সমাজও 'ঐতিহ্যে আর ভারতীয় সংস্কৃতিকে' আঘাত দেয়ার জন্য এই 'অশিক্ষিত' বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীহীন মানুষটির প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। হ্যাঁ, তিনি আর কেউ নন, বাংলা সাহিত্যের 'চরিত্রহীন' শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়।

বাঙালী মুসলমানদের প্রথম শিক্ষিত পূর্বপুরুষ হিসেবে কাজি মোতাহার হোসেন চৌধুরীদের প্রজন্মকে ধরার যথেষ্ঠ তথ্য প্রমাণ আছে। ড. আহমদ শরীফের মতে, ১৮৯০-এর পরে যেসব বাঙালী নিম্নবিত্ত মুসলমানের জন্ম তাদেরই কেউ কেউ

শিক্ষিত হয়েছিল। আমাদের সেই প্রথম শিক্ষিত পূর্বপুরুষদের মননে পাশ্চত্য লেখাপড়া শেখার কারণে নিজেদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে একটা সচেতনতা গড়ে উঠেছিল। তারাই তাই 'শ্রীকান্তে' 'বাঙালী ও মুসলমান ছেলেদের মধ্যে ফুটবলা খেলা' লাইনটি পড়ে ক্ষুব্ধ হয়ে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি আমাদের বাঙালী ভাবেন না? শরৎ উত্তর করেছিলেন, মুসলমান বলতে তিনি হিন্দুস্তানী অবাঙালী মুসলমানদের বুঝিয়েছিলেন...। ১৮৯০ থেকে ধরে ১৯৩৬ পর্যন্ত ধরলে বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীর প্রগতিশীলতার একটা প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। ১৯৩৬ সালে ঢাকায় এসে শরৎচন্দ্র সুধি সমাবেশে ঘোষণা করেছিলেন তিনি মুসলমান সমাজ নিয়ে উপন্যাস লিখবেন। সেদিন হলভরা দর্শকদের আসন থেকে মিজানুর রহমান নামের একজন লেখক শরৎচন্দ্রকে (পরে প্রবন্ধ আকারে লিখে) আহবান জানিয়েছিলেন, আপনি হিন্দু সমাজকে চাবুক মেরে যেভাবে কশাঘাত করছেন প্রতিকারের আশায় একইভাবে মুসলিম সমাজকে কশাঘাত করুন...। শরৎচন্দ্র কথা দিয়েছিলেন তিনি মুসলিম সমাজকে নিয়ে লিখবেন। কাজি মোতাহার হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে দাবা খেলার সময়ও একই মত দিয়েছিলেন। কিন্তু 'মহেশ' ছাড়া শরতের কলমে মুসলিম সমাজ বিষয়ে আর কোন লেখা নেই। কেন থেমে গেলো? মহেশে মুসলিম সমাজের কোন ত্রুটি নিয়ে কথা নেই। বরং বর্ণহিন্দু জমিদার ও ব্রাহ্মণ সমাজের হাতে নিপীড়িত হওয়ার করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শরৎ জীবিত থাকাকালে এই গল্প পাঠ্য হয়েছিল স্কুলে। কিন্তু মহেশ গল্পে এক মুসলমানের হাতে গোমাতাকে হত্যার মত জঘন্ন পাপাচারের কাহিনী থাকাতে হিন্দু সমাজের মানহানী হয়েছে এই যুক্তিতে 'সনাতন হিন্দু সমাজের' দাবীর মুখে গল্পটি পরে পাঠ্য পুস্তক থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। যে চাবুক শরৎ হিন্দু সমাজের উপর প্রয়োগ করেছিলেন, সেই একই চাবুক যদি মুসলিম সমাজের দিকে উত্থিত করতেন তাহলে আজকের সেই মিজানুর রহমানদের উত্তর পুরুষরাই কি শরৎচন্দ্রকে মুসলিম বিদ্বেষী কিংবা ইসলাম বিদ্বেষী বলতেন না? ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দেয়া ডি লিট উপাধির প্রতিবাদ জানিয়েছিল মুসলিম ছাত্ররা। অভিযোগ শরৎ মুসলমানদের হেয়

করেছিলেন। তাকে সংবর্ধনা জানাতে অস্বীকৃতি জানায় মুসলিম ছাত্রদের পরিচালিত সংগঠনগুলো। সেকথায় আসছি পরে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে "মুসলিম বিদ্বেষী" হিসেবে আমাদের দেশে উপস্থাপন করা হয়। এর কারণ সম্ভবত 'আনন্দ মঠ' লেখা। মুসলিম শাসনামলকে সমালোচনা করাকে বাঙালী মুসলমান তাদের 'পূর্বপুরুষকে' সমালোচনা হিসেবেই দেখে। তুরষ্ক বা মধ্য এশিয়া থেকে আসা হানাদার মুসলিম শাসকদের এখানকার কনভার্ট মুসলমান নিজেদের পূর্বপুরুষ বলে ধরে নিয়েছে। নিজেদের তারা রাজার জাত বলে মনে করত। রিকশা চালানো উর্দু কি বাংলা ভাষি মুসলমান সে-ও মনে করত বৃটিশ আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে পথের ভিক্ষিরি বানিয়েছে! সেই আত্মপ্রসাদ পাঠশালায় পড়া রহিম শেখ করিম শেখের অন্তরেও বহমান ছিল। তাই শরৎচন্দ্রের সামনে তারা 'শ্যলক বঙ্কিমের রচনাবলী' নামের একটা বই রাখার সাহস করেছিল। শরৎচন্দ্র তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, অপমান করতে এসেছো? কাজি মোতাহার হোসেন চৌধুরী মুসলিম সমাজ নিয়ে লেখার জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছেলেন। তিনি আক্ষেপ করে বলছিলেন, 'আপনারা কি আমাদের একঘরে করে রাখবেন?' কিন্তু কোলকাতায় তখন কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। বাংলা সাহিত্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান যিনি, সেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিয়ে বসে আছেন! তার কবিতাকে সেন্সর করতে দাবী করেছে মুসলমান সমাজ। 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের মানি কবিতায় 'আরঙজেব ভারত যবে/করিতেছিল খান খান' লাইনটি এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলিমরা তাদের "পূর্বপুরুষদের" অপমানিত করা হয়েছে বলে দাবী করে রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা চাইতে বলেছিল। বলেছিল, ঐ লাইন তুলে নিতে হবে...। একই সময় কোলকাতায় বিখ্যাত বইয়ের দোকান 'সেন ব্রাদার্স'-এর মালিক ভোলানাথ সেনকে তার দুইজন কর্মচারী সমেত ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে দুইজন মুসলিম যুবক নৃশংসভাব খুন করে। 'প্রাচীন কাহিনী' নামে তৃতীয় ও চর্তুথ শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে একটি বই ভোলানাথ তার প্রকাশনি থেকে প্রকাশ করেছিলেন। বইটির

লেখক স্বয়ং ভোলানাথ সেন। এটি সরকার পাঠ্য পুস্তক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই বইতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদের নামে যে চ্যাপ্টার ছিল সেখানে ভাল ভাল কথা বলে তাকে সম্মান করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে একটা ছবি ছাপা হয়েছিল যেখানে মসজিদে মুহাম্মদ দাঁড়িয়ে আছেন আর তার সামনে জিব্রাইল উপস্থিত। এই ছবিটি বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে অনুমতি নিয়ে বইতে প্রকাশ করা হয়েছিল। অর্থ্যাৎ, এই ছবিটি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। কিন্তু ঢাকার একজন মুসলমান জমিদারের ধর্মানুভূতিতে প্রচন্ড আঘাত লাগে এই ছবি দেখে। সে কোলকাতায় এসে দুজন পাঞ্জাবী মুসলমান যুবককে উদ্বুদ্ধ করে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। জমিদারের কথামত দুই যুবক ভোলানাথকে খুন করে যায় তার দুই কর্মচারী সমেত। বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ দত্ত এই সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছিলেন, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আমরা যখন স্বদেশী করে আলীপুরে প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম তখন ঐ যুবক দুটিও এই জেলে ছিল। দেখতাম তাদের দেখতে মুসলমান নারী-পুরুষ এসে ভীড় করত। তারা তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা জানিয়ে যেতো। পরে মুসলিম সমাজের কাছে তারা শহীদের মর্যাদা পেযেছিল। ইসলামের নবীকে নিয়ে সুখ্যাতি করেও খুন হতে হয়েছিল লেখক ও প্রকাশক ভোলানাথ সেনকে। শরৎ শ্রীকান্তে গহর নামের একটা চরিত্র তৈরি করে মুসলিমদের কাছ থেকে মিশ্র অনুভূতির শিকার হযেছিলেন। মহেশে গফুর আর আমিনাকে হিন্দু বর্ণবাদীদের হাতে নিগৃহিত হওয়ার চিত্র এঁকেছিলেন। কিন্তু যখন গফুর আর আমিনাকে নিজ সমাজ ও ধর্মের হাতে নিপীড়িত হওয়ার চিত্র আঁকবেন তখন তার কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটা শরৎ বুঝতে পেরেছিলেন। মুখল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মন্দির ভাঙ্গার ইতিহাস বর্ণনা করাকে যেখানে 'মুসলিম বিদ্বেষ' হিসেবে বিবেচিত হয় সেখানে শরৎ মসুলিম সমাজকে চাবুক মেরে কশাঘাত করবেন! শরৎচন্দ্রের হাতে 'বঙ্কিম দুহিতা' নামের একটি বই এসেছিল যেটির লেখক মুসলিম সমাজেরই কেউ। নোংরা নোংরা কথা সেই বইতে লেখা ছিল। অথচ মুসলিম রাজশক্তির তীব্র (কখনো কখনো একপেশে) সমালোচনা করলেও ন্যায্য কথা বলতে তো বঙ্কিম ছাড়েননি। তিনিই লিখেছিলেন, 'হিন্দু হইলেই ভাল হয় না- মুসলমান

হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না- মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল-মন্দ উভয়ের মধ্যেই তুল্যরূপেই আছে। বরং উহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল'। শরৎচন্দ্রকে ধোপানাপিত বন্ধ করে দিয়েছিল সনাতন হিন্দু সমাজ। শরৎ থোড়াই কেয়ার করেছেন তার। কিন্তু মুসলিম সমাজের প্রকৃত চিত্র আঁকতে গেলে শরৎচন্দ্রকে ভোলানাথ সেনের ভাগ্য বরণ করতে হবে- এটি বিলক্ষণ সে-যুগেও শরৎ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই বোধহয় তিনি মত বদলে ছিলেন। কিন্তু এই মত বদল যে নিজের জীবনের ভয়ে তা মনে হয়নি, বরং তিনি যে ভয়টি পেয়েছিলেন, হিন্দুর কলমে মুসলমান সমাজের চিত্র আঁকতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। সে-চিত্র আঁকতে হবে মোতাহার হোসেনদের মধ্য থেকেই কাউকে। এ কথাগুলোই শরৎ জাহানারা চৌধুরী সম্পাদিত 'বর্ষবাণী' (১৩৪২ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় লিখেছেন, '...প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভাল কথার সঙ্গে মন্দ কথাও গল্প উপন্যাসের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দন্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেই গা শিউরে উঠে! ...

রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম বিরোধী, বাংলাদেশ বিরোধী প্রমাণ করতে যতরকম আমড়াগাছি প্রয়োজন তার সবটাই কাজি মোতাহার হোসেন চৌধুরীদের উত্তর পুরুষরা এখন করে চলেছেন। শরৎচন্দ্রের জন্মের দশ-পনেরো বছর পর অর্থাৎ শরৎ যখন নেহাত বালক তখন 'গোজীবন' লিখে মীর মোশাররফ হোসেনকে মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগার দরুণ জেলে যেতে হয়েছিল। মহামারিতে কৃষিকাজের অন্যতম মাধ্যম গরুর সংখ্যা হঠাৎ হ্রাস পাওয়ায় মুসলিমদের গরু জবাই না করতে আহবান জানানোই হয়েছিল কাল। কিন্তু মীরের সাহিত্য ইসলামী মিথ ও গৌরব কেন্দ্রিক ছিল। তার 'বিষাদ সিন্ধু' এক সময় মুসলিমদের কাছে ধর্মীয় বই হিসেবে বিবেচিত হতো। অর্থ্যাৎ মীর মোশারফ হোসেন মুসলিম সমাজের জন্য শরৎচন্দ্র হতে পারেননি। নিজ

সম্প্রদায়ের আত্মসমালোচনা তিনি করেছিলেন ভিন্ন ভাষায়। তার আত্মজীবনী 'আমার জীবন'- এ তিনি লিখেন, "বঙ্গে মুসলমান কী রুপ শোচনীয় দশা ছিল তা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া ওঠে। আমি সেই দুর্ঘটনা যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাই জীবনীতে সন্নিবেশিত করিব। জাতীয় বিদ্যা শিক্ষায় শৈথিল্য, জাতীয় ভাব রক্ষায় শৈথিল্য, শাসন, বিচার, রাজ্য বিভাগ, সমগ্র বিভাগেই মোসলমান শূন্য। বিজাতীয় ভাষার কল্যাণে রাজপুরুষদিগের সহিত মাখামাখি ভাব। কাজেই নির্জীব নিরক্ষর বঙ্গীয় মুসলমান কার্যে তাহাদেরই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক বড় বড় জমিদার ধনী মুসলমান জোড়া জোড়া প্রতিমা তুলিয়া আশ্বিন মাসে প্রতিমা কল্যাণে হাজার হাজার বাহবা গ্রহণ করিয়াছিলেন।'... আরেক জায়গায় হিন্দু বিদ্বেষ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে মোশারফের কন্ঠে, "আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি। পঠন পরিচ্ছেদ হিন্দুয়ানী, চালচলন হিন্দুয়ানী, রাগ ক্রোধ হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী, মুসলমানদের নামও হিন্দুয়ানী। যথা- সামসুদ্দিন - সতীশ, নাজমুল হক- নাজু, বোরহান- বীরু, লতিফ- লতু, মশাররফ- মশা, দায়েম- ডাশ, মেহেদি- মাছি, ফজলুল করিম- ফড়িং এই প্রকার নামে ডাকা হয়'।

বিষাদ সিন্ধু মোশারফ কথিত সামসুদ্দিন আর নাজমুলদের আত্মপরিচয়ের শিকড়কে কারবালাতেই প্রথিত করেছিল যেখানে বঙ্গে শরৎ 'বামুনের মেয়ে' লিখে সনাতন হিন্দুদের বর্ণবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে স্তব্ধ করে দিচ্ছেন। কি রূপ কুখ্যাতি পেয়েছিলেন এইসব লিখে শরৎচন্দ্র তার একটা নজির বাণী দেবীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে বুঝা গিয়েছিল। বাণী দেবী সে সময়ের একজন লেখিকা ছিলেন। তার বাড়ির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অবশ্য শরৎচন্দ্রকে শেষতক যেতে হয়নি। তার আগেই বাণী দেবী শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়ে তার অপারগতার কথা জানিয়ে আসেন। বাণী দেবীর শশুড়বাড়িতে যখন জানতে পারল, শরৎ চাটুজ্যে নামের এক 'চরিত্রহীন' লোককে বাড়িতে ডেকে আনা হচ্ছে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে তখন বাড়ির সবাই বেঁকে বসে। না, এরকম পাপিষ্ঠ লোককে কিছুতে বাড়িতে ডেকে আনা যাবে না...।

এসব আসলে একজন লেখকের শেরপা। যদি সমকালের সঙ্গে না-ই বিরোধ হলো তো আপনি কিসের লেখক! গলায় পদক ঝুলিয়ে, সমাজের প্রত্যেকটা অনুভূতির মূর্তিকে ঠুরে ঠুরে নমস্কার করে দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকার ধান্দা যারা করে তারা চিরকাল শরৎ চাটুজ্যেদের ঘোর সমালোচক হন। আমাদের সময়ে যেমন দেখি হুমায়ূন আজাদ, তাসলিমা নাসরিনদেরকে তাদের সমকালিন লেখকদের বিষেদাগারের লক্ষ্যবস্তু হতে হয়। অভিজিৎ রায়ের বইগুলো কখনো রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক পুরষ্কার পাবে না এটিই পদক প্রাপ্ত বইগুলোর লেখকদের তার প্রতি শত্রু বানাবার জন্য যথেষ্ঠ। তারা জানেন, জলের উপরই দাগ কাটেন তারা। এই স্বঅর্জিত অক্ষমতা তাদেরকে প্রথাবিরোধীদের বিপরীত মেরুতে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কখনো কখনো তাদের বিরুদ্ধে নিজের অজান্তে মুখর হয়ে উঠেন। সব কালে, সব যুগেই তাই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত লেখকরা তাদের সহলেখকদের হাতেই সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত ছিলেন।

শরৎচন্দ্র মনে করতেন লেখকদের কোন জাত নেই ধর্ম নেই। কাজি মোতাহার হোসেন চৌধুরীকে তিনি বলেছিলেন, তারা (লেখকরা) সকলেই মূলে এক ও অভিন্ন। মুসলমান সমাজকে এই অবাঁচ্ছিত ব্যবধান ভুলে যেতে হবে। এই কাজটি মুসলিম সমাজকেই করতে হবে। অর্থাৎ বাঙালী মুসলমানকে তার আত্মপরিচয়কে মেনে নিতে হবে। তার শিকড়কে স্বীকার করে নিতে হবে। শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন এটিই সমাধানের পথ। হিন্দু সমাজ ও ধর্মকে গল্পে উপন্যাসে শরৎচন্দ্র এমনভাবে কষাঘাত করতে লাগলেন যা তার পাঠকদের উপর একটি প্রভাব ফেলতে বাধ্য করেছিল। তার কাহিনী নিয়ে সিনেমা তৈরি হয়েছিল। কুলিন ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের উপর সেই ছবিচিত্রগুলো ছিল সামাজিক আন্দোলনের মত। মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতিদের মত শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিকদের সঙ্গে শরতের বিচার কেউ করবেন না। বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচকরা শরৎকে কখনই তাদের কাতারে রাখবেন না। কিন্তু শরৎ অনন্য এ কারণে যে তিনি তার সমকালকে চাবুক মেরে বুঝিয়ে ছিলেন, এ অন্যায়, এ ঘোরতর

অন্যায়। সমাজ তাকে মোক্ষম জবাব দিয়েছিল, একঘরে করে রেখেছিল। নিম্নবর্ণের নারীকে বিয়ে করেছিলেন। কিংবা বিয়ে করেননি, এই অজুহাতে তাকে একঘরে করে রাখা হয়। সেকথা শরৎচন্দ্র নিজেই তার প্রকাশক হরিদাস চট্টপাধ্যায়কে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। ভাগ্নীর বিয়েতে চারশো টাকা লাগবে। পুরো টাকাটা শরৎচন্দ্রকেই দিতে হবে। যদিও একঘরে হওয়ার কারণে সে বিয়েতে শরতের উপস্থিত থাকাও চলবে না। স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী ব্রাহ্মণ কন্যা নন। তার পরিচয়ও রহস্যে ঘেরা। জোর গুজব ইনিই শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী! সমাজকে একদম রসাতলে ফেলার জন্য তিনি 'চরিত্রহীন' লিখেছিলেন বলে সেযুগের যুব সমাজ বাড়ি এসে চরিত্রহীনের এক কপি পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আরো বলে গিয়েছিল, এসব লিখলে এ পাড়ায় আপনার থাকা চলবে না। এটা ভদ্রপাড়া। লোকে বউ-ঝি নিয়ে ঘর করে... ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ ছিল তিনি সনাতন হিন্দু সমাজকে নিন্দা করেন, হাজার হাজার বছর ধরে চরে আসা প্রথাকে হেয় করতে কটুক্তি করেন। ছোটজাতের পাতে খান। শরৎচন্দ্র তার ভবঘুরে জীবনে হাড়ি-বাগদি শ্রেণীর বাড়িতে খেয়েছেন। তাদের সঙ্গে মিশিছেন। নিজের লেখায় এইসব সমাজচুত্যা ও পতিতাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে ভদ্র সমাজের বাঁধন তিনি খুলে দিতে চান বলে ধর্মবাদী ভদ্র সমাজ তার উপর ফতোয়া জারি করে একঘরে করে দেন। যতীন্দ্রমোহন সিংহ তার 'সাহিত্যের স্বাস্থরক্ষা' বইতে সমাজকে রসাতলে নিয়ে যাবার অভিযোগ তুলে শরৎচন্দ্রকে আক্রমন করেন। শুধু তাই নয়, সভা ডেকে শরৎচন্দ্রকে বয়কটের আহবান জানানো শুরু হয়েছিল। শরৎচন্দ্র সেকথা নিজেই বলেছেন এভাবে, 'আমার মনে পড়ে বয়স যখন অল্প ছিল, এ ব্রতে যখন নতুন ব্রতি, তখন আমন্ত্রণ পেয়েও কত সাহিত্য সভায় দ্বিধায় সংকোচে যেতে পারিনি।...আমার লেখায় দেশ দুনীর্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে এল, এবং সনাতন হিন্দু সমাজ জাহান্নামে গেলো বলে...'। যতীন্দ্রমোহন সিংহ অভিযোগ করেছিলেন 'পল্লীসমাজ' পাঠ করলে সনাতন হিন্দু সমাজের কোন বিধবাই আর থাকবে না। এ তো সমাজের ঘোর অধঃপতন!

শরৎচন্দ্র  সচেতনভাবেই এই সমাজকে ভাঙ্গতে চেয়েছিলেন। লেখকদের সমকালের প্রতি মোহ কতখানি বিপদজনক সেটি বুঝাতে গিয়ে মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করছেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র ও তার সমসাময়িক সাহিত্যিকরা যদি তাকে সমর্থন করতেন তাহলে হিন্দু সমাজের চেহারা আজকে অন্যরকম হতো...। ব্রাহ্মণদের জাতাভিমানকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে তিনি যখন 'বামুনের মেয়ে' লিখলেন তখন তিনি জনপ্রিয়তায় কিংবদন্তিতম। ব্রাহ্মণদেরকে নিচুজাতের হিন্দুরা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই মান্য করে থাকে। তাই এরকম একটা বিষয় নিয়ে তিনি লিখতে গেলেন কাদের খুশি করার জন্য? কিংবা 'গৃহদাহ' লিখে শিক্ষিত ব্রাহ্মসমাজকে চটাতে গেলেন কেন? প্রধাবিরোধী শরৎ কারুর মুখ চেয়ে লিখতেন না। জনপ্রিয়তার অসুখেও তিনি আক্রান্ত হননি। যে মুসলমান সমাজ নিয়ে লিখতে তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন তারাও 'মহেশ' পড়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র যখন সবে লেখালেখি শুরু করেছিলেন, একদিন ছেলেবেলার মাস্টার মশাই ডেকে বলেছিলেন, নিজে যা না দেখেছো, যা বিশ্বাস করো না, তা কখনো লিখো না। জবাবে শরৎ জানিয়েছিলেন, তাই হবে। শরৎ সাহিত্য পড়লেই বুঝা যায় শরৎ তার গোটা জীবন ভর সেকথাই অনুসরণ করেছিলেন। ৫৭তম জন্মদিনের ভাষণে সেকথার পুনরাবৃত্তি করতে তিনি ভুলেন নাই। ভাষাহীনের মুখে ভাষা দেয়ার কথাই তিনি বলেছিলেন। তাই যা সত্য বলে নিজের কাছে মনে হয়েছে তিনি তাই লিখেছেন। তাতে কে অসন্তুষ্ঠ হবে সে ভাবনা তার ছিল না। এ কারণেই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করলে এর বিরোধীতা করেছিল মুসলমান ছাত্ররা। আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছিল, স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সভায় মুসলমান ছাত্ররা বলেছিল, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পদবী দেয়ার বিষয়ে মুসলমান ছাত্রদের কোন হাত থাকত তাহলে তারা কিছুতে শরৎ বাবুকে এই পদবী পেতে দিতেন না। সাহিত্যিক কাজি আবদুল ওদুদ এ বিষয়ে বলেন, ১৯২৬ সালে শরৎচন্দ্র লিখিত 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' প্রবন্ধটির কারণে মুসলমান ছাত্ররা তার বিরোধীতা করেছিলো। কি লিখেছিল শরৎ সে প্রবন্ধে? তিনি লিখেছিলেন,

‘খিলাফৎ আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয় অসত্য। কোন মিথ্যাকে অবলম্বণ করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশী শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এ জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই- এ কোন কথা? যে-দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে-দেশের মানুষ কি খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তূর্কী শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ তূর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ পরাধীন ভারতীয় মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ- অতএব এস একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। ....একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল রাজ্য প্রতিষ্ঠার করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মানুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায় কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই...’। পূর্ব বঙ্গের মুসলমান সমাজ শরতের এই সমালোচনাকে তাদের ‘পূর্বপুরুষদের’ হেয় করা বলে গ্রহণ করেছিল। ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমান তূর্কী, আফগান শাসকদের নিজেদের পূর্বপুরুষ মান্য করে ইতিহাসের এই সত্য ভাষণকে শরৎচন্দ্রের ‘মুসলিম বিদ্বেষ’ হিসেবেই দেখেছিল। অথচ মিজানুর রহমান কিংবা কাজি মোতাহার হোসেন চৌধুরী মুসলিম সমাজকে চাবুক মেরে জাগাতে বলেছিলেন! ‘বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা’ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র যে আশংকার কথা তুলে ধরেছিলেন ১৯৪৭ সালের ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়ে তার আশংকাকে সত্য বলে প্রমাণিত

করেছে। ইংরেজ রাজশক্তিকে তাড়াতে ধর্মকে সামনে এনে, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী পরিচয় যে সর্বনাশ ঘটাতে পারে ভারত পাকিস্তানের নামের দুটো আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম তারই প্রমাণ।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'বর্তমান হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র কড়া কড়া কথা বলেছিলেন মুসলিম সমাজের প্রতি, সেখান থেকে আত্মসমালোচনা নয় বরং শরৎ বিরোধীতাই জেগে উঠেছিল। অনেক ভাষণে, চিঠিতে, লেখায় বাঙালী মুসলমানকে তার শেকড়ের দিকে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু কাজি আবদুল ওদুদদের উত্তর পুরুষ আবদুল মান্নান সৈয়দরা সাহিত্যিকের বর্ণ ও ধর্ম পরিচয়ের বাইরে যেতে রাজি নন। 'বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিক' নামের সাম্প্রদায়িক পরিচয় বলতে গেলে পূর্ববঙ্গীয় তথা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। কাজে বলাই যায় শরৎ যেমন বলেছিলেন, লেখকের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, তারা সকলেই মূলে এক ও অভিন্ন, আর এই চেতনার লেখকরাই সাহিত্যর মাধ্যেমে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠা করবেন- তার কোন চেষ্টা সচেতনভাবেই এখানে করা হয়নি।

আমাদের প্রথাবিরোধীতার ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। পূর্ব বঙ্গে মীর মোশাররফ হোসেনের 'গোজীবন' রচনাকে বিবেচনায় ধরলেও আমার এখানেও দেখতে পাই আত্মপরিচয়ের অন্ধ অনুসরণ। বেগম রোকেয়ার সাহসী রচনা শুধুমাত্র শিকড়ের বিচ্ছিন্নতার দরুণ আজ ভিন্ন অর্থে প্রচারিত হয়। শরৎচন্দ্র বাঙালী মুসলমানকে তার শিকড়ে পৌঁছাতে বলেছিলেন। আরজ আলী মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধানে' তো আসলে শিকড়ের সন্ধান। সে ধারাবাহিকতায় হুমায়ূন আজাদ হয়ে অভিজিৎ রায়...। বাংলা সাহিত্যির ইতিহাস ধরলে শরৎচন্দ্রই প্রথম ও প্রভাবশালী প্রধাবিরোধী। সমাজপতিদের হাতে যিনি শিকার হয়েছিলেন ফতোয়ার। মৃত্যুর ৭৮ বছর পরও তার রচনা আমাদের প্রথা ভাঙ্গতে অনুপ্রাণিত করে। তার গোটা সাহিত্য জীবন নিয়ে তুমুল সমালোচনা করা গেলেও সমাজ ও ধর্মকে তিনি যে রকম নির্মমভাবে আঘাত করেছিলেন তা কেবলই মানবিক প্রেম থেকে। দেশ ও দেশের মানুষের চরম দুঃখ-

কষ্ট দেখে, তাদের জীবনের সমাজ ও ধর্মের প্রতিবন্ধকতা দেখে ক্ষুব্ধ শরৎ যে পাল্টা আঘাত তার লেখায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের জন্য এ থেকে বড় শিক্ষাটা হচ্ছে, আমাদের মুক্তচিন্তার চর্চাটা যেন এমনই দেশ ও দেশের মানুষের কথা ভেবে হয়। মানুষের নিপীড়িত হওয়ায় যার মন কাঁদে, তারই সাজে দেশ ও জাতির বিশ্বাসের মূল্যে আঘাত করা। এ আঘাত কল্যাণের। মানুষকে ভালোবেসে...।

# বাংলা বাঙালী মুসলমান

**১.**

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির আগমণ শুনেই লক্ষণ সেন ভয়ে কাপুরুষের মত পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলে বাংলা মুসলিম শাসনের অধিনে চলে আসে- এরকম ডাঁহা মিথ্যা ইতিহাস দিয়েই আমাদের চিন্তার ঊষা লগ্নের সূচনা ঘটে। এরকম ইতিহাস মুসলমান ঘরের ছেলেমেয়েরা মুখস্থ করে দুটি জিনিস রপ্ত করে তাদের জীবনের একদম শুরুতে- এক, নিজেকে একমাত্র মুসলিম পরিচয়ে আবিষ্কার করে মুসলিম বীরত্বে গর্বিত হওয়া, দুই- হিন্দুদের পরাজিত প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে শেখা। কথিত লক্ষণ সেনের পলায়নের কাহিনী তার প্রতিবেশী হিন্দুর প্রতি তাকে করে তুলে হীন অবজ্ঞার মানসিকতা। কেননা এই ইতিহাসের পটভূমিকায় বলা হয়, হিন্দু সেন রাজাদের অত্যাচার আর নিপীড়ণে অতিষ্ঠ বাংলার প্রজারা একটা পরিবর্তনের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছিল তাই বখতিয়ার খিলজির আগমন ছিল তাদের কাছে সাক্ষাৎ 'কল্কি অবতারের' ধরাধামে আগমন! তারপর স্থানীয় হিন্দুরা ইসলামের সুমহান শান্তি আর ভ্রাতিত্বের নির্দেশনা দেখে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। এবং এরাই হচ্ছে বাঙালী মুসলমানদের পূর্ব পুরুষ...। কয়েক শতাব্দি ধরে এই অসত্য, অর্ধসত্য, বিভ্রান্তিকর, কাল্পনিক, অনুমাননির্ভর ইতিহাস পাঠ করিয়ে বাঙালী মুসলমানকে পরিকল্পিতভাবে স্রেফ মুসলমান ও ভারতবর্ষে একদা শাসন করা মুসলিম শাসকদের উত্তরাধীকারী হিসেবে নিজেদের ভাবতে শিখানো হয়েছে। এই ভ্রান্ত কুয়াশার জাল ছিন্ন করে বাঙালী মুসলমানের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উন্মোচন করার আগে আসুন বখতিয়ার খিলজির কথিত 'বঙ্গ বিজয়' বিষয়ে কিছু জেনে নেয়া যাক।

বখতিয়ার খিলজি আদতেই 'বঙ্গ বিজয়' করেনি শুরুতেই এটা সাফ জানিয়ে রাখি। তিনি ১২০৩ ও ১২০৪ সালে নদীয়া ও নবদ্বীপের কিছু অংশ জয় করেছিলেন মাত্র। এদিকে লক্ষণ সেন ১১৭০ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ও রাজত্ব করছিলেন। ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথ মত দেন এ সময়কালে লক্ষণ সেন মারা গিয়েছিলেন। তাহলে কি করে বখতিয়ার খিলজির ভয়ে লক্ষণ সেন খিড়কি দিয়ে পলায়ণ করেছিলেন? মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই সিরাজ তার ইতিহাস বইতে লক্ষণ সেনের কাপুরুষের মত পলায়নের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের ৪৩ বছর পর নিজামউদ্দীন ও সামসুদ্দীন নামক দুই ভ্রাতৃদ্বয়ের মুখে শুনে। এই একই বইতে তিনি নিজেই লিখেছেন তখন পর্যন্ত লক্ষণ সেনের বংশধররা পূর্ববঙ্গ রাজত্ব করছিল। 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থ মিনহাজ শেষ করেন ১২৬০ সালে। ১১৭০ থেকে ১২০০ সালের মধ্যে লক্ষণ সেনের তিন পুত্র মাধব সেন, বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের পূর্ববঙ্গ শাসনের তাম্রলিপি নির্দশন পাওয়া গেছে। তাছাড়া মিনহাজ নিজেই ১২৬০ পর্যন্ত বঙ্গে সেন রাজাদের শাসন চলার কথা স্বীকার করছেন। বুঝাই যাচ্ছে বখতিয়ার খিলজি সুবিশাল বঙ্গের নদীয়া ও নবদ্বীপের খানিকটা দখল করেছিলেন স্থানীয় সেন রাজাদের অনুগত কোন সামন্তকে পরাজিত করে। এই নদীয়া জয়ের কাহিনীও যে অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সেটা বখতিয়ারের ১৮ জন সৈন্য নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের কথা শুনলেই বুঝা যায়। এই কাহিনী বিশ্বাস করতে হলে প্রচুর কল্পনা শক্তির অধিকারী হতে হয়। লক্ষণ সেনের বিরাট সৈন্য বাহিনীর কথা জেনেও বখতিয়ার কি করে মাত্র ১৮ জন সৈন্য নিয়ে নদীয়া-নবদ্বীপ দখল করতে সাহস করবেন? এ কারণেই পরবর্তীকালের সমস্ত ঐতিহাসিকরাই লক্ষণ সেনকে 'বঙ্গ বিজয়ী' বলেননি। আসল সত্য হচ্ছে ত্রয়োদশ শতাব্দির পূর্বে বাংলায় মুসলিম শাসনের কোন অস্বিত্ব পাওয়া যায় না। ১২৮৯ সালেও মধু সেন নামের একজন শাসকের নাম পাওয়া যায় যিনি পূর্ববঙ্গ শাসন করছিলেন। কাজেই বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের মতে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গের রাজধানী নদীয়া বিজয়ের কাহিনী অলীক, কল্পাশ্রয়ী।

বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয় ও লক্ষণ সেনের খিড়কি দিয়ে কাপুরুষের মত পলায়নের এই গল্প বঙ্গের মুসলিমদের কাছে পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও প্রতিবেশী হিন্দুদের থেকে দুরত্ব তৈরি করতেই যুগ যুগ ধরে পঠিত হয়ে আসছে এতে কোন সন্দেহ নেই। আজো বাংলাদেশের পাঠ্যবইতে বখতিয়ারের এই কল্পিত বঙ্গ বিজয় ও লক্ষণ সেনের খিড়কি দিয়ে 'কাপুরুষের মত' পলায়ন কাহিনী অপরিবর্তিত থেকে যাওয়া সেই সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মিশনকে বাস্তবায়নের অবিরাম চেষ্টা মাত্র। এই ইতিহাস পাঠের শিক্ষা কবি আল মাহমুদ তার 'বখতিয়ারের ঘোড়া' কবিতায় স্পষ্ট করেছেন এভাবে-

"...আল্লার সেপাই তিনি, দুঃখীদের রাজা।
যেখানে আজান দিতে ভয় পান মোমেনরা,
আর মানুষ করে মানুষের পূজা,
সেখানেই আসেন তিনি। খিলজীদের শাদা ঘোড়ার সোয়ারি।
দ্যাখো দ্যাখো জালিম পালায় খিড়কি দিয়ে
দ্যাখো, দ্যাখো।
মায়ের কেচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়ে বালক
তুলোর ভেতর অশ্বখুরের শব্দে স্বপ্ন তার
নিশেন ওড়ায়।..."।

বখতিয়ারের ইতিহাস থেকেই বাঙালী মুসলমান নিজেদের ইতিহাসের সূচনা বলে মনে করে। এই ইতিহাসকে পুঁজি করে বাঙালী মুসলমান যখন নিজেদের অসাম্প্রদায়িক, বাঙালী ও বাঙালী সংস্কৃতির ধারকবাহক বলে দাবী করে তাতে ভিত্তিটা দূর্বল ও ভঙ্গুর থেকে যায়। যে কারণে বাঙালী মুসলমানের অসাম্প্রদায়িকতার প্রচেষ্টা বার বার তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেছে। গত শতাব্দির ষাটের দশকের সেই প্রচেষ্টাকে তাই আমরা দেখি এক দশকের মধ্যেই ধসে যায়। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাঙালীও বখতিয়ারের আলখেল্লার নিচ থেকে আসে বলে তার নিজের

ভেতর স্ববিরোধীতা থাকে প্রকট আকারে। আমাদের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা বখতিয়ারের আলখেল্লার নিচ থেকে উদয় হয়েছিলেন। সে কথায় আসছি ধীরে ধীরে...।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক হামলা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মনে ধর্মীয় বিদ্বেষ একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় নির্দেশনার সংমিশ্রণ। তাই বাঙালী হিন্দু মুসলমানের 'অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান' একটি রাজনৈতিক ভাষ্য বলেই মনে হয়। মূলত রাজনৈতিকভাবে এই দুই ধর্মীয় সাম্প্রদায়কে একটি অভিন্ন জাতীয়তাবাদী পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন অবিভিক্ত ভারতবর্ষে সেক্যুলার হিন্দু কংগ্রেস নেতারা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনকে বেগবান করতে মুসমানদেরও এতে অংশগ্রহণ করানো। এই প্রচেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। অত্যন্ত চড়া দরে ভারতবর্ষ তার মুল্য শোধ করেছিল। বাঙালী মুসলমান ধর্মীয় পরিচয়ে পৃথক হয়ে নিজেদের মুসলমান ও তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবী করে। এটি ছিল বাঙালী হিন্দু থেকে নিজেদের আলাদা 'জাতিসত্ত্বার' স্বাতন্ত্র্যতা প্রতিষ্ঠার একটি চেষ্টা।

## ২.

বাংলা তথা ভারতবর্ষে 'মুসলিম' এই পরিচয়ের জনগোষ্ঠির সূচনা অষ্টম শতাব্দি থেকে বললে ভুল হবে না। এই শতকে আরব বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করতে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর সমুদ্র উপকূলে নোঙর ফেলে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণেই এই আরব বণিকরা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত হয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে বাংলার সমুদ্র তীরাঞ্চলে এসে তাদের জাহাজ ভিড়ায়। বাণিজ্যের কারণে বণিকদের দীর্ঘদিন সমুদ্র উপকূলে অবস্থান করতে হতো। এর ফলে স্থানীয় নারীদের বিয়ে করে সন্তানসন্ততি দিয়ে একটা সীমিত আকারের 'মুসলিম সমাজ' তাদের হাতে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আদি এই মুসলিম সমাজ খুব একটা বিস্তার লাভ করতে পারেনি। আরব বণিকদের

স্থানীয় রমনীদের গর্ভে জন্মানো সন্তানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। বিধায় সীমিত আকারের এই জনগোষ্ঠি স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছিল। তাদের নাম, পদবীগুলোও স্থানীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী রাখা হতো। বাঙালী মুসলমানের ক্রমধারা বিষয়ে সবিস্তারে বলার আগে ভারতবর্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের সামরিক অভিযানের বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পেক্ষাপট লিখতে গিয়ে অনেকেই দাবী করেন পাল রাজাদের হটিয়ে দক্ষিণ ভারতের সেনদের বাংলা রাজত্বের সময় যে দমনমূলক শাসন চালানো হয়েছিল তাতে অতিষ্ঠ জনগণ মুসলমানদের আগমনকে দুহাত তুলে স্বাগত জানিয়েছিল। জাতিভেদ প্রথার নিস্পেষণে অতিষ্ঠ স্থানীয়রা মুসলিম শাসকদের সঙ্গে আসা সুফিদের উদার ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল...। এই দাবী সঠিক নয় নানা কারণেই মনে হয়। দ্বাদশ শতাব্দিতে মুসলমানদের সমস্ত ক্রোধ ছিল বৌদ্ধদের উপর। কেননা এই সময়কালে তুরস্কের বৌদ্ধরা মুসলিম সাম্রাজ্যে হানা দিতে শুরু করে। এসব কারণে মুসলিমদের কাছে বৌদ্ধরা হয়ে উঠেছিল ইসলামের শত্রু। তাই বখতিয়ার খিলজি মগধ দখল করার পর বৌদ্ধদের কচু কাটা করেছিলেন। বৌদ্ধরা জীবন বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় লাভ করেছিল। বখতিয়ারের মগধ জয়ের অর্ধ শতাব্দির মধ্যে বৌদ্ধ শাসক হালাকু খার হাতে বাগদাদ নগরির পতন ঘটেছিল। কাজেই স্থানীয় বৌদ্ধ জনসাধারণ সেনদের দমনমূলক শাসন থেকে রক্ষা পেতে মুসলমানদের স্বাগত জানিয়েছিল এরকম দাবী যৌক্তিক নয়। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ বখতিয়ারের বৌদ্ধ বিহারগুলোর আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, শিক্ষার্থী ও জ্ঞান তাপসদের নির্বিচারে হত্যার গর্বিত বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে বাংলায় হিন্দু সেন বংশের শাসনকালে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নিপীড়িত হচ্ছিল। বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের হাতে নিগৃহত হচ্ছিল। কিন্তু এতেই মুসলিম শাসকদের দেখে তাদের উৎফুল্লিত হবার কি আসলেই কোন কারণ ছিল? দেখা যায় অষ্টম শতাব্দিতে মুসলমানরা যখন সিন্ধু জয় করে নিলো তখন বড় প্রশ্ন দেখা দিলো মুসলমানদের দেশে হিন্দুদের বাঁচিয়ে রাখা হবে কিনা? নাকি জিজিয়া কর নিয়ে

তাদের নতমস্তকে বাস করতে দেয়া হবে। মুসলিম শাসকদের প্রয়োজন ছিল বিজিতদের সম্পদ ও অধিকৃত জমি থেকে নির্ধারিত হারে খাজনা (জিজিয়া) আদায় করা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ইসলামী বিধি। ইসলাম মতে কেবল মাত্র আহলে কিতাবীদের (ইহুদী-খ্রিস্টান) জিজিয়া কর দিয়ে মুসলিদের বশ্যতা স্বীকার করে বাঁচার অধিকার আছে। কিন্তু যারা হিন্দু পৌত্তলিক তাদের বেলায় জিজিয়া কর দিয়ে বাঁচার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ইসলামে স্বীকৃত নয়। তাদের একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম গ্রহণ করা নয়ত তলোয়ারের নিচে আপোষে মস্তক এগিয়ে দেয়া। কিন্তু শেষতক সিদ্ধান্ত হলো এদের জিজিয়া করের বিনিময়ে মুসলিম শাসনে বশ্যতা স্বীকার পূর্বক বসবাসের অধিকার দেয়া যেতে পারে। এই সিদ্ধান্ত হবার পরে জিজিয়া কর প্রদানের সময় একটি অভিনব দৃশ্যও ঘটতে দেখা গেলো। জিজিয়া দেয়ার সময় একজন হিন্দুকে মুখ হা করতে বলা হতো, আর সেখানে একজন মুসলিম সৈনিক থুতু ফেলে তাকে খেতে বাধ্য করা হতো। থুতু খাওয়ার বিষয়টি সম্ভবত হিন্দুদের আহলে কিতাবী না হওয়াতে বোনাস হিসেবে দেয়া হয়েছিল সম্ভবত- কে জানে! তাহলে দেখা যাচ্ছে সেন বংশের শাসনামলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা সামাজিকভাবে নিপীড়িত থাকলেও মুসলিম শাসনের তাদের ভাগ্যের কোন হেরফের ঘটেনি। তাহলে দলে দলে বাংলার বৌদ্ধ আর হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের কাহিনীর কি হবে? কিসের টানে তারা ইসলামে আকর্ষিত হয়েছিল? বলছি সেকথা...।

বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে প্রচলিত ইতিহাস মতে ভারতবর্ষের পূর্ববঙ্গ ছাড়া আর কোথাও ধর্মান্তরিত মুসলিম পাওয়া বেশ দুষ্কর। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের মুসলিমরাই একমাত্র স্থানীয় যারা ধর্মান্তরিত হয়েছিল ধারণা করা হয়। যে কারণে ভারতে দিল্লির মত বড় বড় শহরগুলোতে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখা যায় মুসলিমদের সাড়ে পাঁচশ বছরের শাসনামলে। তাহলে বাংলায় কি এমন ঘটেছিল যে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল? বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে বাংলায় ধর্মান্তকরণের কোন প্রমাণ নেই! হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের কোন ঐতিহাসিক দলিল আজতক পাওয়া

যায়নি। এটি ছিল একটি অনুমান ভিত্তিক ধারণা মাত্র। দুঃখজনক হচ্ছে যতটুকু দলিল পাওয়া যায় তা কেবল মাত্র উচ্চ রাজ বংশীয়দের সম্বন্ধে, সাধারণ আম জনতার কোন ইতিহাস নেই। তাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তনেরও কোন ইতিহাস নেই। তবু নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে ঐতিহাসিকদের মতে বাংলার মুসলমানরা পশ্চিম এশীয় মুসলিমদের বংশধর। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকদের মত হচ্ছে বাংলার মুসলমানরা বাংলার হিন্দুদের সমগোত্রীয় এবং সম্ভবত স্থানীয়দের ধর্মান্তরণের ফসল। ১৮৭২ সালের আদম শুমারির তত্ত্বাবধায়ক রেভারলির মতে বাংলার মুসলমানরা স্থানীয় হিন্দুদের ধর্মান্তকরণের ফল। কিন্তু তার এই ধারণার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। রেভারলির এই অপ্রমাণিত ধারণাকে আমলে নিয়ে পরবর্তীতে হাবার্ট রিজলি নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় বলেছেন, বাঙালী মুসলমান মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের ফল যাদের রক্তে ইন্দো-আর্য রক্তও প্রবাহিত। মনে রাখতে হবে বাঙালী মুসলমানরা এরকম ধারণটা বরাবরই প্রত্যাখ্যান করেছিল। নিজেদের পূর্বপুরুষ হিসেবে কোন নিম্নবর্ণের হিন্দুকে তারা মেনে নিতে চায়নি। এটিকে তারা তাদের পূর্বপুরুষের মুখে কালি লেপনের ষড়যন্ত্র বলেছে। এ কারণে দেখা যায় খন্দকার ফজলে রাব্বি রেভারলি-রিজলিকে ভুল বলে অভিমত দেন এবং তিনি দাবী করেন, বাংলায় ধর্মান্তরণের কোন প্রমাণ নেই, এমন কোন অকাট্য দলিল নেই যেখান থেকে হিন্দুদের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আফগান, তুরস্ক, আরব, ইরান ও দক্ষিণ ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ মুসলিম অভিবাসী হয়ে বাংলায় আসার প্রামান্য দলিল রয়েছে। এছাড়া পূর্ববঙ্গে বহু জায়গার মুসলিম নামকরণ থেকেও বুঝা যায় মুসলিম শাসনে এখানে অভিবাসী মুসলিমদের শাসকরা জমি দান করেছিলেন। রাব্বি রিজলির নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উত্তরে জানিয়েছেন, অভিবাসী মুসলিমদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে যে সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাতে ও স্থানীয় জীবনযাপন ইত্যাদিতে তাদের দৈহিক গঠন স্থানীয়দের কাছাকাছি এসেছিল ধাপে ধাপে। দেখা যাচ্ছে রিজলি ও রাব্বিদের কথাতে যথেষ্ঠ যুক্তি আছে। তবু তাদের দাবী একপেশে বলেই মনে হয়। কোনটিই পুরোপুরি মেনে নেয়ার মত প্রামাণ্য দলিল আমাদের হাতে নেই। কিন্তু

১৯০১ সালে এ এ গজনভী সবচাইতে যৌক্তিক অনুমানটি করেছিলেন। তিনি মত দেন, বাঙালী মুসলমানের ২০ ভাগ সরাসরি বাইরে থেকে আসা মুসলমানদের বংশধর, ৫০ ভাগ স্থানীয় হিন্দু ও বিদেশী মুসলমানদের যৌন মিলনের ফসল (হানাদার তুর্কি-আফগান-আরব যোদ্ধাদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়ে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ধরে) এবং বাকী ৩০ ভাগ হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত। গজনভীর মতে এই সমিষ্টির নামই হচ্ছে "বাঙালী মুসলমান"। সব দিক বিবেচনায় গজনভীর গবেষণাই যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়। সুফিদের প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা ও কঠিন জিজিয়া থেকে রেহাই পেতে ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ ইতিহাসে আছে। একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক বাইরে থেকে আসা মুসলিমদের বাংলায় থেকে যাওয়ার অকাট্য দলিল রয়েছে। গজনভীর নৃতাত্ত্বিক দাবীটিকে আজকের যুগে এসেও সবচেয়ে যৌক্তিক বলে মনে হয় বাঙালী মুসলমানের আত্মপরিচয় সংটককে প্রত্যক্ষ করে। বাঙালী মুসলমানের জিনে ৭০ ভাগ সরাসরি ও পরোক্ষভাবে আরবী-তুর্কী-আফগান রক্ত প্রবাহিত। রাব্বি'র দাবী ও গজনভীর তত্ত্বকে আমলে নিলে বাঙালী মুসলমানের আত্মপরিচয়ের সংকট বুঝতে অসুবিধা হয় না।

**৩.**

বাংলা শব্দটি তিব্বতী 'বঙস' শব্দ থেকে আসার দাবী করেছেন পন্ডিতরা। বঙস শব্দের অর্থ ভেজা বা আর্দ্র। পন্ডিতদের এইমত যে সঠিক তা বাংলার ভূ-প্রকৃতি দেখলে বেশি করে মনে হয়। 'বাংলাদেশ' বলতে এখন যে ভূ-রাষ্ট্রটির কথা আমরা জানি সেটি একটি রাজনৈতিক পরিচয়, 'বাংলা দেশ' বলতে যে মাটি ও জনগোষ্ঠির কথা আমরা জানি তার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। যে বিশাল অঞ্চলকে বঙ্গদেশ বলা হয় তা সাত-আটশো বছর আগে নানা খন্ডে বিভক্ত ছিল। মূলত ১৪ শতকে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলো একত্র করে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। খ্রিস্টের জন্মের ৫০০ বছর আগে ভাষাতাত্ত্বিক পাণিণির অষ্টাধ্যায়ীতে 'গৌড়'

শব্দটি উল্লেখ আছে, তবে বঙ্গ বলতে কিছুর উল্লেখ নেই। কিন্তু তার তিনশ বছর পর ‘পতাঞ্জলী’ অষ্টাধ্যায়ীর টিকাতে ‘বঙ্গ’ শব্দটি যুক্ত করেন। ‘ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ’ রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব কালে, সেখানেও বঙ্গের উল্লেখ নেই কিন্তু বঙ্গের সমসাময়িক অন্য অঞ্চলগুলোর উল্লেখ আছে। একই সময় বেদে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় মহাভারতেও। মোঘল দরবারের ঐতিহাসিক আবুল ফজল ‘বাংলাকে’ দাঙ্গাহাঙ্গামার ঘর বলে উল্লেখ করেছিলেন। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে পাল ও সেন রাজাদের গৌড়ের শাসক বলা হতো, বঙ্গের নয়, ত্রয়োদশ শতকে মুসলিমরা এই অঞ্চল দখল করলে তাদেরও গৌড় বিজেতা বলে হয়েছিল, বঙ্গ বিজেতা নয়। আমরা বর্তমানে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার যে ‘সুমহান সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য’ নিয়ে গর্ব করি তার বয়েস বড়জোর দেড়শো বছরের। পূর্ববঙ্গের ‘মুসলমান বাঙালীর’ সংস্কৃতিক আন্দোলন ও ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি পাকিস্তান ভেঙ্গে ‘বাংলাদেশ’ সৃষ্টির ইতিহাসও ২৩ বছরের। এই ২৩ বছরকে (১৯৪৭-১৯৭১) মূল্যায়ন করতে হবে সুদীর্ঘ বঙ্গের ইতিহাসের আলোকেই। নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ইতিহাস ছাড়া আজকের ‘বাংলাদেশে’ যে ধর্মীয় ও জাতিগত নিপীড়ন চালানো হচ্ছে তাকে বুঝা যাবে না-।

**৪.**

আর্যরা আসার পূর্বে যেমন অনার্য বলতে কোন শব্দের প্রয়োজন পড়েনি, তেমনি ‘মুসলমানী’ শব্দের পূর্বে হিন্দুয়ানী বলতে কিছুর অস্বত্বি ছিল না। মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা জরুরী। মুসলিম শাসনকালে রাজদরবারে বেশ সম্মানিত পদে হিন্দুদের নিয়োগ পেতে আমরা দেখি। মুসলিম সম্রাটের সেনাপতি একজন হিন্দু- এরকমটা ভারতবর্ষের মুসলিম শাসন সময়ে বিরল কোন ঘটনা নয়। বিষয়টি আবহমান কাল জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্যময় সম্পর্কের প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই থলের বিড়াল লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মুসলিম শাসনে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগের ইতিহাস বর্ণনা করার আগে শুরুতেই বলা উচিত, সুলতানী আমলের প্রথম দুইশত বছরে

কোন হিন্দুকে রাজকাজে নিয়োগ দেয়া হয়নি। পরবর্তীকালে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ দেয়ার কারণটিও রাজনৈতিক। বিবাদমান মুসলিম শক্তিগুলোকে দুর্বল করতে, তাদের দমন করতে স্থানীয় বিশ্বস্ত হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০ খ্রি:) সর্বপ্রথম তার শাসনকার্যে স্থানীয় হিন্দুদের নিয়োগ দান করেছিলেন। কিন্তু শুরুতেই প্রবল বিরোধের শিকার হতে হলো সুলতানকে। সুফি দরবেশ মাওলানা মুজফর শামস বলখি সুলতানকে চিঠি লিখে জানালেন, সুলতান এই নিয়োগ দ্বারা সরাসরি কুরাআন-সুন্নাহ ও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আইনকে অমান্য করেছেন। কাফেরদের ছোটখাটো কাজে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু শাসনকার্যে তাদের নিয়োগ ঘোরতোর ইসলাম বিরোধী কাজ। ইসলাম কোন কাফেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে যোগ্য বা সমান মনে করে না।... সুলতান বা সম্রাটদের উপর সুফি দরবেশদের প্রচন্ড প্রভাব ছিল। যদি কোন সুলতান সুফিদের মতামতকে উপেক্ষার সাহস করতেন, তবে সুফিরা পাশ্ববর্তী কোন মুসলিম শাসককে চিঠি লিখে আক্রমনের অনুরোধ জানাতেন সুলতানের বিরুদ্ধে। এছাড়া শাসকদের কেউ সে অর্থে ধর্মকর্ম পালন না করলেও প্রবল ধর্মানুরাগী ছিলেন। নিজে ধর্মকর্ম পালন না করার অপরাধবোধেই সম্ভবত মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, সুফি দরবেশদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বলখির চিঠিতে সুলতান বিচলিত হয়েছিল বুঝা যায়। কেননা সেসময় চীনা দুতেরা বাংলায় এসে যে বিবরণ লিখেছিলেন তাতে উল্লেখ করেছিলেন, সুলতানের ছোটবড় সব অমাত্যেরা সকলেই মুসলমান। প্রসঙ্গত বলা অসঙ্গত হবে না, পাকিস্তান আমল পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় একজন হিন্দু ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন। এতে কি সে সময়ের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রীয় অবস্থাকে ভাল বলে প্রমাণ করে? বাস্তবতা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা হিন্দুদের পাকিস্তানের নাগরিকই মনে করত না। মুক্তিযুদ্ধের সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর তাদের অত্যাচার আর নির্মমতা দেখে বুঝা যায় সেসময় পাকিস্তানে ধর্মীয় পরিচয়ে কতখানি বিদ্বেষ জারি ছিল।

৫.

“যাহার মাথায় দেখে তুলসী পাত।
হাত গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ।
বৃক্ষ তলে থুইয়া মারে ব্রজ কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল”...
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুক
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে”।

পঞ্চাদশ শতকে বিজয় গুপ্ত লিখিত ‘মনসামঙ্গলে’ হিন্দু কর্মচারীকে নিয়ে তামাশার চিত্র এভাবেই ফুটে উঠেছে। সাধারণ আম জনতার জীবনযাত্রা মধ্যযুগের সাহিত্যে কতকটা ফুটে উঠেছে। এসব থেকে আন্দাজ করার যায় সে সময়কার সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি কেমন ছিল। বিজয় গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’ ছিল জনমানুষের সাহিত্য। বাংলার নিম্নবর্ণের দেবী মনসার উচ্চাসন আদায় করে নেয়া ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে এক শ্রেণী লড়াই। শিব ভক্ত চাঁদ সওদাগার নিম্মবর্গের দেবী মনসাকে মান্য করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু চাঁদ সওদাগারের দর্পচূর্ণ হয় অবশেষে। মনসাকে দেবী মেনে নিতে হয়...। সেই মনসামঙ্গলে রাখাল বালকরা যখন ঘট দিয়ে নদীর ধারে মনসা পুজার সূচনা করে তখন দেখা যায় কাজির লোকজন এসে রাখালদের অকথ্য নির্যাতন করে পুজার আয়োজন ভেঙ্গে দেয়। যে কুমার ঘট তৈরি করে দিয়েছিল তাকে গ্রেফতার করা হলো। মনসামঙ্গলে কাজির উক্তি এভাবে উঠে এসেছে- ‘হারামজাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ/আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান/গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা/এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাত মারা”।

চৈতন্যভাগবতের কয়েকটা লাইন, ‘যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে/ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।/কাজি কহিল হিন্দুয়ানী হইল নদীয়া।/করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।... কাজির অত্যাচারে ভীত হয়ে চৈতন্যদেবের চ্যালারা নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইল। হিন্দুদের মধ্যে যারা অবৈষ্ণবী ছিল তারা মনে মনে খুশি হল এই

ভেবে যে এইবার নিমাই পন্ডিতের দর্পচূর্ণ হবে। নিমাই বেদকে অস্বীকার করে যে জাতপাতহীন ধর্ম প্রচার করছে এই হচ্ছে সেই অনাচারের সাজা। কখনো কখনো কোন মুসলিম শাসককে স্থানীয় হিন্দুদের প্রশংসা বা স্তুতি'র কারণ ছিল এইরকম কায়েমী স্বার্থের কারণে। চৈতন্যদেব জাতপাতহীন হিন্দু ধর্মের সংস্কার করতে চাইলে ব্রাহ্মণরা ক্ষেপে গিয়েছিল। কাজি চৈতন্য ভক্তদের কীর্তন বন্ধ করে দিলে স্বভাবতই ব্রাহ্মণরা খুশি হয়েছিল। ঠিক এইরকম কায়েমী স্বার্থ থেকে শরিকদের বঞ্চিত করতে কখনো কখনো শাসন কার্যে হিন্দুদের স্থান দেয়া হতো শাসনকার্যে। ইলিয়াস শাহের পদাতিক বাহিনীর অধিকাংশই ছিল হিন্দু যারা বীরত্ব দেখিয়ে যুদ্ধ করেছিল স্থানীয় হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে। একে তাই অনেকেই ধর্ম সংস্পর্শহীন রাজনীতি হিসেবে দেখার দাবী করেন। কিন্তু ঘটনা মোটেই সেরকম ছিল না। ইলিয়াস শাহ বংশের অন্যতম অমাত্য ছিলেন রাজা গণেশ। সুলতানী আমলের ছয়শো বছরের ইতিহাসে গণেশই ছিলেন একমাত্র অমুসলিম শাসক। কিন্তু তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেন সুফিরা। গণেশের পুত্র জাদু পিতার বিরুদ্ধে সিংহাসন দখল করতে শত্রু পক্ষের সঙ্গে হাত মেলায়। নিজেকে সিংহাসনের যোগ্য করতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 'জালালউদ্দিন শাহ' নাম নিয়ে মুসলমানদের সহায়তায় হিন্দু রাজা গণেশকে পরাজিত করে সিংহাসনে বসেন। ত্রয়োদশ শতকের জাফর খা গাজি থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের মুর্শিদকুলী খাঁ পর্যন্ত সকলেই মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করেছিলেন। এদের কারুর কারুর যেমন আলীবর্দি খা, মুর্শিদকুলী খানদের শাসনকার্যে হিন্দুদের উচ্চপদে থাকার নজির রয়েছে। একই সময়ে রচিত চৈতন্যভাগবতের আছে, 'বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল।/চন্দ্রশেখরের মন্ডু মুঘলে কাটিল'। চন্দ্রশেখর ছিলেন চৈতন্যদেবের একজন ভক্ত। তার গৃহদেবতা স্বর্ণের তৈরি ভেবে মুসলমান সৈন্যরা তা কেড়ে নিতে হামলা চালায়। সুলতানী আমলে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মাণের ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যখন মসজিদগুলোর সংস্কার কাজ চলে। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়েই যে মসজিদগুলো নির্মাণ তা ইতিহাসবিদরা নিশ্চিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের দুটো লাইনে তখনকার

মুসলিম শাসকদের মনোভাব কি ছিল তার কবিতায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন এভাবে- "আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই/সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই"। কবিতাটা রচিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কালে যখন সেনাপতি মানসিংহ প্রাতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন জাহাঙ্গীরের হয়ে। সে যুগে মুসলিম শাসনে কি পরিমাণ মুসলিম বিদ্বেষ বেড়েছিল তার কিছু দলিল পাওয়া যায় অষ্টদশ শতকে ভারতচন্দ্রের লেখা 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে। নবাব সিরাজদৌলার নানা আলীবর্দি খানকে 'দুরাত্মা' উল্লেখ করা হয়েছে অন্নদামঙ্গলে। উড়িষ্যায় হিন্দু ধর্মের প্রতি দমন পীড়ন করার কারণে নন্দি ক্রুদ্ধ হয়ে উক্তি করেছিল, 'মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ে শূল/করিব যবন সব সমুল নির্মূল'। এই কাব্যের আরেক জায়গয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের জবানে বলা হয়েছে, 'দেহ জ্বলিয়া যায় মোর বামন দেখিয়া/বামনেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া.../ আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই/সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই'। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের 'পাশাপাশি বসবাসের' যে চিত্র মধ্যযুগের সাহিত্যে আমরা পাই তাতে কি করে একে সৌহাদ্যময় সম্পর্ক বলা যাবে? দীনেশচন্দ্র সেন যিনি হিন্দু-মুসলমানের প্রীতিময় সম্পর্কে বর্ণনা করতে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন তিনিও 'বৃহৎ বঙ্গ' বইতে উল্লেখ করেছেন, 'মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সিন্ধুকী (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু রমনীগণকে অপহরণ করিয়াছে। ষোড়ষ শতাব্দিতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ির দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বনিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপ কত যে হিন্দু রমনীকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। পল্লী গীতিকাগুলিতে এই সকল করুণ কাহিনী বিবৃত আছে'।

**৬.**

বাংলার ছয়শো বছরের মুসলিম শাসনের পুরোটাই হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর ঘৃণা আর বিদ্বেষ একটা ঐতিহাসিক চেহারা নিয়েছে। জাতিভেদ হিন্দু সমাজকে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। কুসংস্কার আর অনাচারে নিমজ্জিত হিন্দু ধর্মে জাতিচ্যুতি কি মহামারির আকার নিয়েছিল খুলনার খান জাহান আলীর শাসন আমল

খানিকটা দেখা যায়। খান জাহান আলী ছল-চাতুরী করে তার ব্রাহ্মণ কর্মচারীর জাত মেরে তাকে হিন্দু সমাজ থেকে পতিত করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ভিন্ন কোন পথ রাখেননি। এই ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণকে ইতিহাসে 'পিরালী' বলে অভিহত করে থাকে। খান জাহান আলী তার নব দীক্ষিত শিষ্য তাহের আলীকে আদর করে 'পীর আলী' বলে ডাকত যা পরে লোকমুখে 'পিরালী' হয়ে পড়ে। বর্বর ব্রাহ্মণ সমাজ এইসব ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণদের আত্মীয়স্বজনকেও একঘরে করার ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে 'পিরালী বামুন' নাম দিয়ে সমাজচ্যুত করে। কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, সিঙ্গিয়ার মুস্তফী পরিবার, দক্ষিণ ডিহির রায় চৌধুরী পরিবার, খুলনার পিঠাভোগের ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মণদের দেয়া অভিশপ্ত পিরালী বামুন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এসব পরিবারের পুত্রকন্যাদের বিয়ে দেয়াই কঠিন হয়ে পড়েছিল। হিন্দুরা এইসবের জন্য মোটেই অনুতপ্ত ছিল না কারণ তাদের কাছে শাস্ত্রের বিধি অলঙ্ঘনীয়। একইভাবে মুসলিমরা হিন্দুদের দেবালয় ভাঙ্গা, জিজিয়া কর বসানো ইত্যাদির জন্য কোন মনোবেদনা অনুভব করত না কারণ এসবই ইসলামী শাস্ত্রে আদেশ করা হয়েছে বলে তারা উৎফুল্ল থাকত। এইরকম ভিত্তির উপর কেমন করে আবহমান বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই হয়ে বসবাস করেছিল জানা মুশকিল। মধ্যযুগের সাহিত্যগুলোতে ফুটে উঠেছে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর বিদ্বেষ আর ঘৃণা। মধ্যযুগের কবি আলাওল তার কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন হিন্দুর দেবতারা অর্থহীন, ইসলামই একমাত্র মোক্ষলাভের উপায় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। অন্যদিকে বৈষ্ণব গ্রন্থ 'প্রেমবিলাসে' মুসলিম শাসনকেই সকল দুঃখের একমাত্র কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। যদিও আমাদের প্রচলিত কিছু ইতিহাস দাবী করে আবহমানকালের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর একই সত্ত্বার দুটো দিক ছিল তার প্রমাণ মুসলমানদের পীরের দরগায় হিন্দুদের উপস্থিতি কিংবা হিন্দু সাধুদের প্রতি মুসলিমদের সম্মান জানানো। কিংবা রাত জেগে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের রাম-সীতার পাঠ দেখা, পক্ষান্তরে বিষাদ সিন্ধুর পাঠ শুনতে হিন্দুর মুসলমান বাড়িতে যাওয়া। মূলত বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সৌহার্য একটি রাজনৈতিক প্রচারণা। এটি ভারতবর্ষের সুক্যলার হিন্দু

রাজনৈতিক নেতাদের একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু ভারতীয় মুসলিম নেতারা নিজেদের ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পৃথক সত্ত্বা বলে স্বীকার করতেন বলেই ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে মুসলিমরা (জাতিতে তুর্কি, আফগান, আরব) ভারতে এসে যে নতুন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেন তার সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতি ও ধর্মের স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষার জন্য একে 'হিন্দু সংস্কৃতি' নাম দিলেন। অনেকটা আর্যরা আসার পর যেমন অনার্য পরিচয়টি তৈরি হয়েছিল। 'হিন্দু ধর্ম' 'হিন্দু সংস্কৃতি' বলতে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না মুসলিম আগমনের পূর্বে। ভারতে বৌদ্ধসহ আরো বেশি কিছু উল্লেখযোগ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল, এইসব ধর্মের বিপুল জনগোষ্ঠি নিজেদের ধর্ম ও জীবনে যে সংস্কৃতি বহমান ছিল তাকে রক্ষা করার জন্য কখনোই 'হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি' পরিহার বা স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষার চেষ্টা করেননি। সেমিটিক ধর্মগুলোর সব ক'টির উৎপত্তি স্থল একই ভূমি ও সংস্কৃতি থেকে বলে তাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিবাদ থাকলেও কোনদিনই 'ইহুদী সংস্কৃতি' বা 'খ্রিস্টান' সংস্কৃতি' এইরকম মোটা দাগে সংস্কৃতি বিরুদ্ধাচারণের উদারহণ নেই। এ কারণেই ইসলাম ধর্মের ইহুদী ও খ্রিস্টান অনুসঙ্গ বেশি হওয়ার কারণে তাদের 'হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির' প্রতি যতখানি রাগ-ক্ষোভ বা ছুঁতমার্গ তার এক শতাংশও আরবের ইহুদী-খ্রিস্টান কালচার বিষয়ে অনুপস্থিত। বাস্তবতা হচ্ছে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্কৃতির একটি সংকলনের নাম হচ্ছে 'হিন্দু সংস্কৃতি'। ঠিক ভারতবর্ষের স্থানীয় উৎস থেকে জন্ম নেয়া সকল ধর্মের সংকলনের নামও 'হিন্দু ধর্ম'।

## ৭.

বাঙালী মুসলমান প্রগতিশীলদের উত্থান ইংরেজ আমলে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাংলার গ্রামগুলিতে হিন্দু অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্কুল খুলে ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই সুযোগে মুসলমান ঘরের দু-চারজন ছেলেও স্কুলে গিয়েছিল মাদ্রাসামক্তবে না গিয়ে। এদের মধ্যে থেকেই আমরা পরবর্তীকালে পাই কাজি

মোতাহার হোসেনদের মত প্রগতিশীলদের। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে 'বাঙালী আর মুসলমান ছেলেদের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ' এইরকম একটি লাইন দেখে মনোক্ষুণ্ন হয়ে কাজি সাহেব নালিশ জানিয়ে ছিলেন খোদ শরৎচন্দ্রকেই। যদিও লেখক দাবী করেছিলেন মুসলমান বলতে তিনি হিন্দুস্তানী মুসলমনাদের কথা বুঝিয়েছেন, বাঙালী মুসলমানদেরকে বুঝাননি। বাংলার মুসলমানও বাঙালী- এই বোধটি প্রতিষ্ঠিত করা ছিল পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের প্রগতিশীলতার হাতেখড়ি। মাওলান আকরাম খাঁ ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান। তাদেরকে বলা হয় 'পীরালী মুসলমান'। ইনারা কোন মুসলিম সুফি বা শাসকের হাতে হিন্দুত্ব খুইয়েছিলেন জাতমারার মত কোন ঘটনায়। স্বয়ং আকরাম খাঁ নিজেদের ধর্মান্তরিত মুসলিম স্বীকার করতে চাননি। অন্যত্র এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি বলে এখানে সেই ইতিহাস থেকে বিরত হলাম। দুঃখজনক হচ্ছে আকরাম খাঁ'রা নিজেদের বাঙালী বলে অস্বীকার করতেন। তাদের পারিবারিক ভাষা ছিল উর্দু। দাবী করতেন তাদের পূর্বপুরুষ আরব থেকে এসেছিল। কাজেই একই সঙ্গে বাঙালী থাকা ও না থাকাটা প্রায়শই বাঙালী মুসলমানের একক চর্চা বলেই মনে হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বরাবরই দেখা গেছে বাঙালী হিন্দুরাও এক পর্যায়ে মুসলমানদের বাঙালী নয় এমন একটা ধারণা করে বসে আছে। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে মুসলমানরা 'খেলাফত আন্দোলন' শুরু করলে মুসলমানের জাতিসত্ত্বা নিয়ে অন্যরা প্রশ্ন তোলে। তুরস্কের খিলাফতের খলিফাকে নিজেদের খলিফা, তুরস্কের শেষ ইসলামী খিলফাতকে রক্ষা করার দাবী করলে এতকাল ভারতের যেসব হিন্দু রাজনৈতিক ও চিন্তক 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের' স্বপ্ন দেখতেন, এবং যারা কল্পিত আবহমানকালের হিন্দু-মুসলমান সৌহাদ্যের ইতিহাস প্রচার করতেন তারা পর্যন্ত ভাবিকালের একটা বিভেদের দৃশ্য কল্পনা করে আতংকিত হয়ে পড়েছিলেন। তাদের সকলের আশংকাই সত্য হয়েছিল। ভারতকে ভাগ করেছিল মুসলমানরা। আর এই কাজটি এককভাবে সফল করেছিল বাঙালী মুসলমানরা, যারা তখন নিঃসন্দিহান তাদের আত্মপরিচয় নিয়ে, তারা কেবলই মুসলমান, আগে বা পিছে বাঙালী বসানোর কোন প্রয়োজন নেই...।

৮.

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভারতীয় হিন্দুদের একটা অংশ ভাগ্যান্বেষে ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জে অভিবাসী হয়ে নিজেদের ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। নিজেদের অবস্থাকে ভিএস নাইপল উল্লেখ করেছেন এভাবে, 'শহরে ভারতীয় লোক খুব কম ছিল। রাস্তাঘাটে আমাদের মতো তেমন কাউকে চোখে পড়ত না; নিজেকে সেখানে কেমন যেন অনাহূত আগন্তুকের মতো লাগত...। আমাদের মানসিকতা আমাদেরকে চারপাশের নানা জাতির সংমিশ্রণে তৈরি ভিন্ন ঔপনিবেশিক পরিবেশ থেকে পৃথক করে রেখেছিল...'। এই সংস্কৃতি ভিন্নতা, উপনিবেশিক শাসক এইসব কিছু অভিবাসী ভারতীয় যারা দেড় শতাব্দি আগে এখানে এসেছে তারা কি স্থানীয়দের উপর বিচ্ছিন্নতাবাদ চাপাতে চেয়েছিল কিংবা তাদেরকে নিজেদের শাসনে অধিনস্ত করতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা করেছিল? কিংবা ফেলে আসা ভারতের কোন হিন্দু শাসককে নিজেদের শাসক ভেবে অভিন্ন ভ্রাত্বিবোধ অনুভব করেছে? ছয়শত বছরের মুসলিম শাসনের ফলে স্থানীয় ও অভিবাসী মুসলিমদের সংমিশ্রনে ভারতীয় মুসলিম ঠিক কিসের তরে ইসলামী বিশ্বের শেষ খিলাফত রক্ষার্থে আন্দোলনে নামে পরাধীন ভারতবর্ষে? গান্ধিজি তার অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এই তথাকথিত খিলাফত আন্দোলনে নিজের সমর্থন দিয়েছিলেন। মুসলিম নেতারাও খিলাফতের দাবীকে কংগ্রেস মেনে নেওয়ায় অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে। বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস উপরে দীর্ঘ সময় নিয়ে আলোচনা করেছি। বিংশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল কাল্পনিক ইতিহাস তৈরি করে তার ভিত্তির উপর মহৎ অসাম্প্রদায়িক একটি অভিন্ন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পরিচয় তৈরি করতে যাওয়া। কিন্তু যারা নিজেদের তুরস্কের খলিফার প্রজা মনে করে, সেই মানসিক বৈকল্যেকে আরোগ্য না করে যে কৃত্রিম মিলনের প্রচেষ্টা হয়েছিল, তারই ফলে বিয়োগান্ত রক্তপাতময় দেশভাগ সংগঠিত হয়।

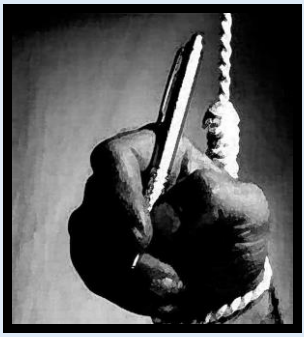
উইলিয়াম হাওয়ার্ড রাসেল ১৮৫৮ থেকে ১৮৫৯ টাইমস পত্রিকায় ভারতীয় সাধারণ মানুষের দুর্দশা দেখে লিখেছিলেন, সাধারণ মানুষগুলো পেট ভরে খেতে পারে না। হাড় জিরজিরে দুর্বুল শরীর নিয়ে তারা ব্রিটিশদের আগে আসা অন্য শাসকদের জন্য যেভাবে খেটেছিল সেভাবেই ব্রিটিশ শাসকদের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে...। ভারতের এই সাধারণ মানুষ আসলে কারা? ভারতীয় মুসলমান নিজেদের শাসক জাতি বলে মনে করত। ইংরেজরা তাদের কাছ থেকে শাসন কেড়ে নিয়েছে। সেই শাসক আদায় করে তারা ফের ভারতকে সপ্তম শতাব্দির অনুকরণে শাসন করবে- এইরকম চিন্তা ও ভাবনা যে সম্প্রদায় তার যাবতীয় জাগতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে লালন করে তারা কি করে ভারতের অবশিষ্ঠ বৃহৎ জনগোষ্ঠির সঙ্গে অভিন্ন জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে? ভিএস নাইপল অত্যন্ত কঠোরভাবে মুসলিম শাসনামলকে বলেছেন, স্প্যানিয়ার্ডদের সামনে মেক্সিকান এবং পেরুভিয়ানরা যেমন অসহায় ছিল। আক্রমণকারীদের ঐ সব সভ্যতার প্রায় অর্ধেক যেভাবে খান খান হয়ে গিয়েছিল ভারতের সভ্যতাও মুসলমানদের হাতে সেভাবে ধ্বংস হয়ে যায়...। নিঃসন্দেহে নাইপলের কথায় যুক্তি আছে। এক নলন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত সমস্ত বই পুড়িয়ে প্রাচীন ভারতের একটা চিত্রকে বখতিয়ার খিলজী ধ্বংস করে ফেলেছি। হানাদারদের কাছে স্থানীয় ইতিহাস, জ্ঞান, সভ্যতার কোন মুল্য থাকবে না সেটাই স্বাভাবিক। নাইপল যাকে বলেছেন 'ভারতের অতীতের বর্ণনা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে...'।

১৯৪৭ সালে বাঙালী মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করলেও একই সঙ্গে তারা পাকিস্তানে বাংলা ভাষার দাবীতে আন্দোলন করে। এটিকে বাঙালী মুসলমান তাদের প্রগতিশীলতার একটি নমুনা হিসেবে দাখিল করে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে একটি অনন্য ঘটনা। কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের দাবীকৃত প্রগতিশীলতা শুরুতেই মারাত্মক হোঁচট খায় যখন বাংলাদেশকে একটি ইসলামী চেতনার মুসলিম রাষ্ট্রের অনুরূপ হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন নতুন কিছু না। সাম্প্রতিক সময়ের রামু, মালোপাড়া, নাসিরনগরের হামলা-নির্যাতন ইতিহাস বর্হিভূত হঠাৎ কোন পদক্ষলন নয়। এর রয়েছে সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণাদি যা উপরে আলোচনা করেছি। এই আলোচনা আত্মসমালোচনার। বাঙালী মুসলমানের আত্মসমালোচনা ব্যতিত মুক্তি নাই...।

**তথ্যসূত্র:**

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (২) বাংলা দেশের ইতিহাস, রমেশচনন্দ্র মজুমদার (৩) বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা, আকবর আলী খান (৪) বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, বিনয় ঘোষ (৫) চিন্ময় বঙ্গ, ক্ষিতিমোহন সেন (৬) দেওবন্দ আন্দোলন, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা: ইয়াহিয়া (৭) দুশো বছরের বাংলার নথি, ত্রিপুরা বসু (৮) হাজার বছরের বাঙালীর ইতিহাস, গোলাম মুরশিদ (৯) আমার পড়া লেখা, ভিএস নাইপল (১০) সুন্দর বনের ইতিহাস, এ এফ এম আবদুল জলিল (১১) সেরা মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা, নাসির হেলাল (১২) (১৩) শরৎচন্দ্র, গোপালচন্দ্র রায় (১৪) শরৎ রচনা সমগ্র (১৫) শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র (১৬) বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ, আহমদ শরীফ (১৭) আমার জীবনী, মীর মোশাররফ হোসেন (১৮) আনন্দ মঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় (১৯) দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান (২০) নজরুল ইসলাম, বাঙালী মুসলমান ও তূর্কি বিপ্লব, সলিমুল্লাহ খান (২১) ভারত স্বাধীন হল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (২২) আমি বিজয় দেখেছি, এম আর আখতার মুকুল (২৩) ইন্টারনেট।



## সুষুপ্ত পাঠক

বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার প্রসারে ব্লগ, ফেসবুক এবং অনলাইন ওয়েবে যেকজন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে নিজের স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন তাদের মধ্যে **সুষুপ্ত পাঠক** অন্যতম।

গবেষণা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ করার সহজাত দক্ষতায় তার প্রতিটি লেখা অনন্য হয়ে ওঠে প্রতিবার! অনেকেই যখন চটুল মুত্রবিদ্যায় নিজেকে রংয়ের ফাঁনুস তৈরি করতে ব্যস্ত, ঠিক সে সময়ে **সুষুপ্ত পাঠক** নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন মিথ-প্রথা-আচারের মুখোশ উন্মোচনে। লেখার জগতে তার কলম-কিবোর্ডের আছে ইর্ষা করার মত প্রাচুর্য! এবং বারাবরের মতই তার লেখার মূল লক্ষ্য মানবিক মানুষের নির্মাণ।

**'কারুর রক্ত চাইতে আসিনি'** তার প্রথম প্রকাশিত ইবুক।

**নরসুন্দর মানুষ**

**একটি ইস্টিশন ইবুক**

www.istishon.com

